টং লিং

লীলা মজুমদার

শুধু গল্প নয়

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

প্রকাশক :
পি. রায়
রে অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস্ (পাবলিশিং) এর পক্ষে
২ গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :
পুলিনচন্দ্র বেরা
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
স্বপন রায়চৌধুরী

অলংকরণ :
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য : দশ টাকা

শুধু গল্প নয়

অভিযান

আমি অত ছোটদের গল্প বড়দের গল্পের তফাৎ বুঝি না। চারদিকে যেমন দেখি তেমন লিখি। তার চেয়েও বেশি শিখি। যে-সব কথা সন্দেহ করি, কিংবা আঁচ করি, তাও লিখি। সম্ভাব্য সব কথাই লিখি। সম্ভাব্য বলতেও শুধু যে-সব ব্যাপার হয়ে ঘটে চুকেবুকে গেছে, সেটুকুমাত্র বুঝি না। আমার কাছে যা হয়নি, অন্তত হয়েছে বলে শুনিনি, কিন্তু যে-কোনো সময়ে হলেও হতে পারে, তাও সম্ভব, তাও সত্যি।

ব্যাপারটা আগাগোড়া আমাদের পাড়ার নালুঠাকুরঝির মুখে শোনা, তবে ছেলেগুলোকে আমিও দেখেছি। বল খেলে আমাদের জানলা-টানলা ভাঙে। তা দু-বছর আগে পুজোর ছুটিতে ওদের মধ্যে সবচেয়ে জবরদস্ত গোটা পাঁচেক ছেলে ঠিক করল সাইকেল চেপে গিরিডি যাবে। বয়স সব ১৬-১৭-১৮, কেউ দশের পরীক্ষা দেবে, কেউ বারোর, কেউ সবে পাশ করেছে। তাদের মধ্যে নালু-ঠাকুরঝির নাতি গনাও ছিল। সে আবার মাধ্যমিকে ফেল করেছিল। তবে তাতে নাকি হিংসুটে পরীক্ষকদের হাত ছিল, ঠাকুরঝি বললেন।

গেরস্তবাড়ির ছেলে সবাই। রেল-ভাড়া হোটেল খরচা দিয়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, এতে খালি পথের খাওয়া-দাওয়া বাবদ সামান্য হাতখরচা ছাড়া কোনো বালাই নেই। কাজেই কারো বাড়ি থেকে কোনো আপত্তি হল না। গনাটার উৎসাহ দেখে কে। কার কাছ থেকে একটা রোড-ম্যাপও জোগাড় করে ফেলল। বর্ধমান

অবধি গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে সোজা পথ। বর্ধমানে পুলুর দাদার শ্বশুরবাড়ি, সেখানে রাত কাটানো। বর্ধমানের পর একটু ঘুরো পথ। মধ্যিখানে মস্ত বন। স্থানীয় লোকেরা তার একটা বিশ্রী নাম দিয়েছে—রক্তখাগীর বন। তাই শুনে ওদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। বিপদ না থাকলে আবার অ্যাডভেঞ্চার কিসের? নালুঠাকুরঝি বললেন, 'তা ভয়টা কিসের? গনার কোমরে লোহার ঘুনসি আছে। গুরুদেব দিয়েছেন।'

পাঁচজনের পাঁচটি পুরনো সাইকেল। নিজেরাই মেরামত করে চৌকোস করে রেখেছে। ঘটুর কাকার সাইকেল মেরামতের দোকান আছে পদ্মপুকুরে। শনি-রবি খুড়ো ছুটি নেন, ঘটু চার্জে থাকে। সাইকেল সারানোর কিছু জানতে ওদের বাকি নেই। পথের যাবতীয় সম্ভাব্য বিপর্যয়ের মোকাবিলা করবার জন্য নানা রকম যন্ত্রপাতি, আঠা, তেল ইত্যাদিকে একটা খোপকাটা খাকি ন্যাকড়ার থলিতে পরিপাটি করে জড়িয়ে বেঁধে ঘটু ক্যারিয়ারে আটকে নিয়েছিল। বলা বাহুল্য কাকা পরেও এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরে টের পাননি। একটা বাড়তি শার্ট পেণ্টেলুন, একটা করে তুলোর কম্বল, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। আবার কি চাই?

এই সমস্ত কথাই নালুঠাকরুণ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে এসে বলে গেলেন। শেষের রাতটা থাকা হবে রক্তখাগীর বনে ঢুকবার আধ কিলোমিটার আগে গনার বড়মামার খামারবাড়িতে। তিনি পেনশন নিয়ে ওখানে সস্তায় জমি কিনে মস্ত গোয়াল আর আখের খামার করেছেন। নাকি চমৎকার দোতলা মাটির বাংলো করেছেন। সেখানে ছেলেরা নিশ্চয় আদর-যত্ন পাবে গনার মামার কাছ থেকে। তা বেয়াইমশাই যতই বজ্জাত হোন না কেন, সত্যি কথা আমি বলবই।

এটা কিছু ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়, তবে পটভূমিকাটা তো দেওয়া দরকার, তাই এত কথা। এদিকে সব তো হল। মায় প্রত্যেকের পিঠের

ব্যাগে বিস্কুট, চিঁড়ে-মুড়ি-নাড়ু ইত্যাদি। হেনকালে যাকে সাহেবরা বলে—একাদশ ঘণ্টায় বাধা পড়ল। গনার দাদামশাই এসে ওর ঠাকুরদাকে বললেন—'ফেল করে আবার নাকি হতভাগা আমোদ করতে যাচ্ছেন! তুমি কি বলে মত দিলে বুঝলাম না। ও-সব হবেটবে না, জগা, তোমার এ জন্মে বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না দেখছি।' ব্যাস হয়ে গেল! বুড়োও অমনি বেঁকে বসল। নালুঠাকুরঝির কি রাগ! 'বলিনি বজ্জাৎ বুড়ো! ওষুধ না খেলে ঘুম হয় না, ইয়ে হয় না, ও মত দিতে আসবার কে! আর ইনিও তেমনি, বেয়াইয়ের কথায় ওঠেন বসেন। কারণ এক সময় বেয়াই ওনাদের টিমে স্কুল-ক্যাপ্টেন ছিলেন!'

দাদুকে যখন কিছুতেই মত করানো গেল না, তখন গনা অগত্যা কালো মুখ এবং অতি বিচ্ছিরি বানানের একটা চিঠি নিয়ে ওদের হাতে দিল, যাতে বড়মামার বাড়িতে অসুবিধা না হয়। নালুঠাকুরঝিও সেই রাতের ট্রেনেই কাশীতে বোনের বাড়ি গেলেন। সংসারে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছিল। বাকি ঘটনা খবরের কাগজেই বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে চেপে যাওয়া হয়েছিল।

নির্ধারিত দিনের ভোরবেলায় বাকি চারজন রওনা হয়ে গেল। পুলু, ঘটু, বেচু আর কানাই। এত চমৎকার ভ্রমণ যে একটু পরেই ওরা গনার কথা বেমালুম ভুলেই গেল। মাঝে মাঝে দোকানে থামা, বোয়েমের বিস্কুট আর ভাঁড়ের চা খাওয়া। যথাসময়ে বর্ধমানে পুলুর দাদার শ্বশুরবাড়িতে চিঠি ও কড়াপাকের সন্দেশ পৌঁছে দিয়ে রাজোচিত আদর-যত্ন লাভ। বেশি বর্ণনা দিতে পারলাম না, কারণ নালুঠাকুরঝি তেমন কিছু বলতে পারলেন না। তাছাড়া গল্পের এ জায়গাটার তেমন গুরুত্ব নেই।

পরদিনের যাত্রাপথ আরেকটু কষ্টকর। উঁচুনিচু এবড়ো-খেবড়ো। দু-একবার বাড়তি থামা। একটু-আধটু মেরামতি। পুলুর চেন

ছিঁড়ল, ভাগ্যিস ঘটুর থলিতে বাড়তি একটা ছিল। শেষ পর্যন্ত পা যখন আর চলে না, পথের ধারে ঠিক গনা যেমন বলেছিল, চমৎকার এক খামারবাড়ি। নিজেদের ডাইনামোর বিজলী বাতি, পেছনদিকে খামারবাড়ি।

সকলে যেন হাতে চাঁদ পেল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। হাঁকডাক করে যদি বা গেট খোলানো গেল, সাইকেল ঠেলে ভেতরে পা দেবার আগেই গেঞ্জি পরা বিকট বেঘো-চেহারার এক আধাবয়সী ভদ্রলোক দোতলার ঝোলা বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন— 'বলি, লজ্জা নেই তোদের? গনাটাকে ভালোমানুষ পেয়ে, তার মাথা তো চিবিয়েছিসই, আবার এখানে এসে হানা দিয়েছিস! বেরো বলছি! ন্যাপা, ওদের গেটের বার করে দিয়ে আয়! এক্ষুনি!' তাঁর বেঘো হালচাল দেখে এবারে কারো মুখে কথাই সরল না, ঐ হরিবল্ বানানের চিঠি বের করা দূরের কথা।

সঙ্গে সঙ্গে তেলচিটে চেহারার রোগা কালো এক যুবক একতলার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওদের বলল—'একটু এদিকে এসে শোন, ভাই।' লোকটা ওদের অচেনা হলেও গনার সঙ্গে চেহারার মিল দেখে বোঝা গেল এ-ই হল গনার কুখ্যাত ছোটমামা। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, কাজকম্ম করে না। তা হতে পারে, কিন্তু মনটা যে ভালো তাতে সন্দেহ নেই। আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে বলল, 'দাদা আমাকে দিয়েই খবরটা পাঠিয়েছে বলে আমি দুঃখিত, লজ্জিত।' তারপর বলল—'তা রাতে কোথায় থাকা হবে?'

বাকিটা সত্যি আরব্য উপন্যাসের মতো। ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে সে বলল—'বেশ তো গায়েপায়ে আছ। মনেও যদি তেমনি সাহস থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে রক্তখাগীর বনে চল। সেখানে নাকি আস্তানা পাওয়া যেতে পারে। আমার বন্ধু বটু বলেছিল ওখানে কেউ থাকে না, এ ধারণা ভুল। যাবে তো চল।

আমাকে রডে বসিয়ে নাও। বেশি দূর নয়। আমার অনেক দিনের শখ। হাঁটতে-টাটতে পারব না।'

ওকে নিয়ে ওরা বিনা বাক্যব্যয়ে বনের পথ ধরল। তখনো অন্ধকার হয়নি, যদিও বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। বনে এক সময় ভালো পথ ছিল, এখন লতাপাতায় ঢেকে গেছে। এ পথে কেউ হাঁটা-চলা অন্তত এদানীং যে করেছে, তা মনে হল না। মনে একটু খটকা লাগলেও, ন্যাপামামার উৎসাহ দেখে ওরা ঘাবড়াল না। ওদের মধ্যে পুলুই বড়। সে একবার বলেছিল বটে—'ঠিক পথে যাচ্ছি তো মামা? এদিকে সাত বচ্ছরে কেউ হাঁটেনি মনে হচ্ছে যে।' ন্যাপা হাসল—'পাগল! না জেনে কি আর ভরসন্ধ্যেয় তোমাদের এই আঘাটায় এনে ফেলি। এ বনটা এতকাল প্রাইভেট প্রপার্টি ছিল, এখন সরকার অধিগ্রহণ করে নিচ্ছে। আসল মালিক সাব্যস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তবে দখল নিতে হবে। নইলে মহা ঝামেলা হতে পারে। এটা বন-সংরক্ষণের আওতায় পড়বে। ভালো ভালো গাছ আছে।'

কানাই পড়াশুনোয় ভালো ছিল। সে অবাক হয়ে বলল,—'মামা, এত কথা জানলেন কি করে?' ন্যাপা হাসল—'আমি জানব না? বলে বটু এক দিক থেকে দেখতে গেলে আমার উড্-বি শালা। মানে ওর বোনের সঙ্গে ইয়ে—'বলে ন্যাপা একটু সলজ্জ হেসে চুপ করল। পুলু ঘটু কানাই বেচু সকলে উদ্‌গ্রীব— 'থামলেন কেন, মামা? বোনের সঙ্গে— তারপর?' ন্যাপা গম্ভীর হয়ে গেল— 'সে বড় দুঃখের কথা রে ভাই। মাসে দুশো টাকা আয় দেখাতে না পারলে ওর বাবার মত নেই।' বেচুর রডেই বসেছিল ন্যাপা। তবে বনে ঢুকে ইস্তক সাইকেল ঠেলে হাঁটতে হচ্ছিল। বলা বাহুল্য বেচুর সাইকেলটা ন্যাপাই ঠেলছিল। বেচু তার পিঠ চাপড়ে সাহস দিয়ে বলল—'চিয়ার আপ মামা, দুশো টাকা আমরা আপনাকে সহজেই পাইয়ে দেব।'

সহানুভূতির চোটে আসল কথাটা আরেকটু হলে চাপাই পড়ে যাচ্ছিল। পুলু বলল—'বটু মামা কি বলেছেন? তিনি এর মধ্যে এলেন কি করে?' ন্যাপা অবাক হল '—আরে সে জানবে না? সে তো ঐ বন বিভাগেই চাকরি করে। বনের অবস্থা দেখতে এসে ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেছিল। বজ্রবিদ্যুৎ হলে গাছতলায় কি বিপজ্জনক অবস্থা জানোই বোধ হয়। এদিকে অন্ধকার নেমে গেল, পথ হারিয়ে গেল। হয়তো ভয়েই মরে যেত। হঠাৎ আবছা দেখল ছোট একটা টিলার ওপর একটা লম্ফ জ্বলছে! উঠিপড়ি করে দেখে একটা চমৎকার কাঠের বাড়ি। দরজায় ঘা দিতেই পাল্লা খুলে গেল। দেখা গেল পরমা সুন্দরী এক ফিরিঙ্গি মেয়ে। খুব ফরসা না হলেও যেমন রূপ, তেমনি দয়া! সেই মেয়ে ওদের ডেকে নিয়ে গা মুছবার তোয়ালে, শুকনো জামা, গরম চা, সব দিল। ওরা তিনজন গায়ে নতুন প্রাণ পেল।

তারপর বৃষ্টি থেমে গেল, মেঘ সরে গেল, দেখা গেল তখনো দিন আছে। সেই মেয়েকে কি বলে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। মেয়েটিই বলল—'কিছু বলতে হবে না মাই ডিয়ারস্, খালি আমার এই চিঠিটি শহরের ডাকে দিয়ে দিও। আমার বাড়ির লোকেরা বড় নিষ্ঠুর, জোর করে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বড়লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। তাই আমি যাকে বিয়ে করতে চাই সে আমাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছে। একটু মাইনে বাড়লেই নিয়ে যাবে। কাঠুরেরা খাবার-দাবার বিক্রি করে যায়। আমি বাইরে বেরোই না। পাছে বাড়ির লোকেরা ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু সে কেন আসে না?' বলে কেঁদে ফেলল। বটুরা আর ওদিকে যায়নি, তবে চিঠিটা ডাকে ফেলে দিয়েছিল। কে এক কিরীটীনারায়ণ বসুকে লেখা। এতদিনে তাদের নিশ্চয় বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু বাড়িটা নিশ্চয় আছে। বাড়ি থাকলে আশ্রয়ও আছে।'

পুলু একটু হৃদয়হীন প্যাটার্নের। সে বলল—'বা বা মামা, বেড়ে গল্প ফেঁদে ফেললেন তো মুখে মুখে। ঐরকম মাসে গোটা দুত্তিন ছেপে বেরুলেই তো দুশো টাকা এবং বটুকে শ্যালকরূপে পেয়ে যাবেন।' কি বিশ্রী কথা পুলুর যে বলা যায় না। কিন্তু ঠিক সেই সময়, ওর মুখে ছাই দিয়ে অনতিদূরে টিলার ওপর লম্ফর আলো দেখা গেল। দরজার কড়াও নাড়তে হল না। সবাই দেখল দরজা খুলে লম্ফ হাতে পরমাসুন্দরী সেই ফিরিঙ্গি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিরীটীনারায়ণ তাহলে এখনো তাকে নিয়ে যায়নি !

বনের মধ্যে এমন সুন্দর বাড়ি কেউ ভাবতেও পারে না। টিলার ওপর গাছপালা কম ; তারার আলোয় মরশুমী ফুলে ঘেরা বাড়িটাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। আগাগোড়া কাঠের তৈরি, চারদিকে কাচের জানলা, বিলিতী বইতে যেমন থাকে। এরা চারজন কস্মিনকালেও এমন দেখেনি। এ বাড়িতে রাতে ওরা থাকবে কি করে ঐ ধুলোয় ধূসর চেহারা নিয়ে। চৌকাঠ ডিঙোতেই লজ্জা করছিল। কিন্তু মেয়েটি ভাঙা ভাঙা গলায় ইংরিজিতে বলল—'এসো, তোমরা ভিতরে এসো। হাত পা ধোও, বিছানা পাতাই আছে। কি খেতে দেব তোমাদের ? বাড়িতে যে কিছু নেই। আমি ছাড়া কেউ নেই। কাল আমিও থাকব না।'

ওরা চমকে উঠল। কত দুঃখে কথাগুলো বলা হল তা বোঝা গেল। ছিমছাম বিলিতী কায়দায় সাজানো বসবার ঘর। ন্যাপা সকলের হয়ে বলল—'তাতে কি হয়েছে, ম্যাডাম ? আমরা খেয়ে এসেছি।' আসলে আসেনি খেয়ে, মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ও-কথা বলল। এরাও সায় দিল—'হ্যাঁ, পরটা, কাবাব, দই। এইসব খেয়েছি। একটু শোবার জায়গা পেলেই আমরা খুশি। কাল সকালে চলে যাব।'

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে ওদের বুক ধড়াস্ করে উঠল। অনেক

ছুঃখে অনেক কাঁদলে তবে কারো ও-রকম মুখের চেহারা হয়। একটা ফুলের যেন জলে ধুয়ে ধুয়ে সব রং উঠে গেছে।

ন্যাপার বেশ বয়স, তা চব্বিশ-টব্বিশ তো হবেই। সে বলল—'আপনি কেন চলে যাবেন এমন সুন্দর বাড়ি ছেড়ে?' তার চোখ দিয়ে আরো খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল। সে বলল—'মালিক বাড়ি বেচে দিয়েছেন। কাল তারা দখল নেবে।'

'আর—আর কিরীটীনারায়ণ?'

'তার সঙ্গে নতুন মালিকের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। চল, ঘর দেখিয়ে দিই। সাইকেল বারান্দায় থাক। কেউ নেবে না।'

এমনিতে ওরা এত কথা বলে, এখন কারো মুখে একটা শব্দ



জোগাল না। ওরা মেয়েটির পিছন পিছন সুন্দর একটা শোবার ঘরে ঢুকল। পাশেই স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

শেষ রাতে পুলুর ঘুম ভেঙে গেল। কিসের কটু গন্ধ? ঘরময় কিসের ঝিলিক দিচ্ছে, অদ্ভুত একটা চাপা গন্‌গন্‌ শব্দ। পুলু লাফিয়ে উঠল—'আগুন! আগুন!' কেমন যেন নিশ্বাস ফেলার কষ্ট হচ্ছিল। ওর চেঁচামেচিতে সবাই জেগে উঠল। জিনিসপত্র, জুতো, সাইকেল সব পড়ে রইল, ওরা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে—'ও ম্যাডাম্‌! ও, মিস্‌!'—করে পাগলের মতো এ-ঘর ও-ঘর করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও তাকে পেল না। সব জায়গায় যেতেও পারল না। দেখতে দেখতে সব ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। সোলার টুকরোর মতো শুকনো কাঠের পুরনো বাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ও বাড়িতে সে সুন্দর মেয়ে আর নেই। হয় চলে গেছে, নয় তো— মোট কথা এখন আর কারো বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

আরো ঘণ্টা দুই পরে যখন পাঁচটি দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ রক্তখাগীর বনের বাইরে ন্যাপার বড়দাদার খামারবাড়ির দরজার ওপর আছড়ে পড়ল, তাদের দেখে বড়মামার চক্ষু চড়কগাছ। ন্যাপা তক্ষুণি মুচ্ছো গেল। বাকিদের ভাঙা ভাঙা কথা জুড়ে একটা অস্পষ্ট মানে করে বড়মামাও পড়ে যান আর কি। 'বনের মধ্যে টিলার ওপর কাঠের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড! তোরা বলিস কি রে! এমন তো কখনো শুনিনি। আচ্ছা, এবেলা খেয়েদেয়ে জিরিয়ে নে তো। গনাও কান্নাকাটি করে এসে গেছে কাল রাতের গাড়িতে। আমি না-হয় বনে একটু পরেই লোক পাঠাচ্ছি। অত ব্যস্ত হোস্‌ নে, বাপ।'

কালকের সে বেঘো চেহারার চিহ্নমাত্র নেই! সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছতে মুছতে গনাও এসে হাজির হল। চা-জলখাবারের পর ওরা কারো কথা শুনল না। ন্যাপা, গনা, বড়মামা, জনাচারেক খামারের লোক মিলে মস্ত এক দল করে ওদের সঙ্গে খামারের ছোট ট্রাকে বনের সীমানা পর্যন্ত গিয়ে, পায়ে হেঁটে দু-ঘণ্টা ধরে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও সে বাড়ির কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবে আগাছায় ঢাকা একটা টিলার ওপর চড়ে অবাক হয়ে দেখল সেখানে ওদের সাইকেল, থলি, কম্বল, জুতো ধুলোর উপর পড়ে আছে। ধুলোটার রং কেমন কালচে, যেন বহুদিন আগেকার পোড়া ছাই মেশানো।

স্কূপ

একটা সাক্ষাৎকারের কথা বলি শোন। আমি তো আর সত্যিকার সাংবাদিক নই, কাজেই এটা যে ঠিক এই ভাবেই ঘটেছিল, তা বলতে পারছি না। তবে না ঘটবার কোনো কারণও নেই। শোন তবে। কিন্তু তার আগে জেনে রাখো, সাংবাদিকদের ছাড়া ডিটেকটিভদের চলে না। ডিটেকটিভদের ছাড়া সাংবাদিকদেরও চলে না।

সাংবাদিকরা সর্বদা চমকপ্রদ চাঞ্চল্যকর অবিশ্বাস্য সব সত্যিকার ঘটনা খুঁজে বেড়ায়। তাকে বলে স্কূপ। সাধারণত চোর, ধাপ্পাবাজ, খুনেগুণ্ডা, ব্যাংকডাকাত, চোরাচালানকারী বিষয়ক সত্যি ঘটনার ওপর একটু রংচং চড়ালে দোষ হয় না। কিন্তু আগাগোড়া বানিয়ে লিখলে মেলা ঝামেলা হতে পারে। আমার তো আর সে-সব বালাই নেই। বানিয়ে লিখলেও দোষ নেই। দুঃখের বিষয়, সব চেয়ে অস্বস্তিকর স্কূপগুলো সব সময় ছাপা হয় না।

শিবশংকর একজন উঠতি সাংবাদিক। তার ওপর যাকে বলা যায় টিকটিকিশাস্ত্র, তাই নিয়ে পাগল। ওর কাছে আমার সব জ্ঞাতব্য প্রশ্নের উত্তর পাই। যে বিষয়ে ও কিছুই জানে না, তার পর্যন্ত জবাব পাই। তাতে আমার ভারি সুবিধা হয়। এদিকে সাংবাদিকদের মধ্যে ভারি রেষারেষি; যে যত বড় বড় স্কূপ সবার আগে নিজের কাগজে পৌঁছে দিতে পারে, তার সাফল্য তত বেশি। অথচ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না থাকলেও মুশকিল। প্রত্যেককে যদি প্রত্যেক

জায়গায় সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হত, তাহলে কেউই কিছু করে উঠতে পারত না। তাই ওরা একটা অলিখিত খবর-—সমবায় মতো তৈরি করে। সেখানে যে যা তথ্য পায় সব জমা দেয়, এবং সেখান থেকেই সব খবর সরবরাহ হয়। তবে যে যার পেটোয়া খবরের সবচেয়ে সঙ্গীন জায়গাটা সম্ভবত চেপে যায়, নিজেদের কাগজের এক-তরফা ব্যবহারের জন্য। ঐটুকু ওদের কর্তব্য। এটা আমিও মানি।

এইখানে ডিটেকটিভ এবং দুষ্কৃতকারীদের প্রবেশ। চাঞ্চল্যকর খবরের তারাই হল ১ নং কাঁচা মাল। বলেছি তো এ সমস্ত তথ্য আমি শিবশংকরের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তার মতো দক্ষ সংবাদ-সরবরাহকারী আর আমার জানা নেই। তাছাড়া সে মালপো খেতে ভালোবাসে। খেতে খেতে সে একদিন বলে বসল—'আপনারা জগৎকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন বলে দুষ্কৃতকারীদের সামাজিক উপকারিতার দিকটা বুঝতে পারেন না। ওদের পক্ষটা তো আর শুনতে পান না।' মহা রেগে, মালপোর বাটি সরিয়ে রেখে বললাম—'কিসের উপকারিতা ?'

শিবশংকর হাত বাড়িয়ে বাটি থেকে বড় বড় চার-পাঁচটা মালপো তুলে নিয়ে বলল—'আমিই কি আর আগে অত জানতাম। ঘটুর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমার চোখ খুলে গেছে। ঘটু হল গিয়ে যাকে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা হয়তো বলবেন আবশ্যিক দুষ্কৃতকারী। অর্থাৎ চুরিচামারি জুয়োচুরি ইত্যাদি অহিংস, কিন্তু লাভজনক দুষ্কর্ম না করে ও থাকতে পারে না। ওর নিজের কোনো দোষ নেই, ওর মনের মধ্যে একটা কিছু রোগ আছে যা ওকে ঐ সব করতে বাধ্য করে। যেমন কারো কারো ফিটের ব্যামো থাকে। তাদের কি জেলে দেওয়া হয় ?

সে যাই হোক গে, জামাইবাবুর বড় ভগ্নীপতি হলেন বড় জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, সে তো জানেনই। তাঁকে বলেকয়ে ঘটুর সাক্ষাৎকার

নিলাম। প্রাইভেটলি। অর্থাৎ ভিজিটিং আওয়ারে নয়। অন্য সময়ে। ওর নিজের ঘরে। জেলের ডাক্তারবাবুর সামনে এবং ঘরের অন্য দুজন বাসিন্দাকে সরিয়ে। তাদের কি রাগ! 'এ রকম পক্ষপাতিত্বের কি মানে হতে পারে? আমরা বিক্ষোভ করব।' করলও খানিকটা—চলবে না, চলবে না! তারপর লপসির সময় হয়ে যাওয়াতে, বলে গেল —'এখানেই এর শেষ নয়, এটা শুধু টিফিনের ছুটি।' ঘটুও চঞ্চল হয়ে উঠল—'হিংসে করে আমার ভাগটাও খেয়ে নেবে না তো স্যার?' ডাক্তারবাবু বললেন—'আহা, বলেছি তো, তোমার জন্য আমার বাড়িতে বাড়তি রান্না হচ্ছে। তুমি এখন শিবশংকরের প্রশ্নের জবাব দাও তো ভাই।' ঘটু আঁৎকে উঠল—'এঁরা! প্রশ্ন নাকি? অংকটংক নয় তো?'

শিবশংকর: আরে না, না। নিজে ও-সব জানলে তো প্রশ্ন করব।

ঘটু: (নিশ্চিন্ত হয়ে) ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলুন কি জানতে চান।

শিব: (খুদে রেকর্ডার খুলে) আচ্ছা বলদিকিনি, তুমি ৫-৬ মাস অন্তর একবার করে এখানে মাস দুই কাটিয়ে যাও কেন?

ঘটু: ছুটি করি, স্যার। ডাক্তারবাবু থেকে থেকে যে জন্যে শান্তিনিকেতনে যান। হাওয়া বদল না করলে মানুষ বাঁচে? শরীর মনের একটু যত্ন না নিলে চলে?

শিব: তাই বলে পাঁচিল ঘেরা হয়ে, লপসি খেয়ে?

ঘটু: (চটে) কেন, লপসিটা খুব খারাপ হল কিসে? একটু কাঁচা লংকা আর সরষের তেলের ব্যবস্থা করলে আমার বৌয়ের রান্নার চেয়ে ঢের ভালো।

শিব: কিন্তু বন্ধ থাকতে হয় যে?

ঘটু: আহা, ঘুরে ঘুরে পালিয়ে দৌড়ে লুকিয়ে ছিপিয়ে পয়সা কামানো বুঝি খুব আরামের?

শিব : তবে ওসব কর কেন ?

ঘটু : কি মুশকিল, ঐ তো আমার কাজ। অন্য কাজ আমার ধাতে সয় না। দেশের কত উপকার করি বলুন। আমি তো দেশপ্রেমিক।

শিব : এ্যা, বল কি !

ঘটু : তা নয় তো কি ? আমাদের জন্য কত হাজার হাজার লোক করে খাচ্ছে, তা কখনো ভেবেছেন ? বেশি ঝামেলা করেন যদি তাহলে আমরা দলেদলে চুরি কম্ম ছেড়ে দেব, হ্যাঁ। আমাদের উইনিয়ন আছে জানেন ? খবরের কাগজ থেকে মাইনে পান, কি-ই বা বোঝেন। আমরা সবাই কাগজে চাকরি নিলে এই ধরুন ডাক্তারবাবুর চাকরিটা ফাল্‌তু ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে না ? টিকটিকিরা সক্কলে, পাহারাদার, ওয়ার্ডার, জেলার, উকিল, মোক্তার, আদালত, পুলিশ, সব ফালতু হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরবে। তাই চান ?

শিব : (এতক্ষণে একটু সুযোগ পেয়ে) না, না, তা মোটেই বলছি না। চুরি করবে বই কি। যার যা কাজ।

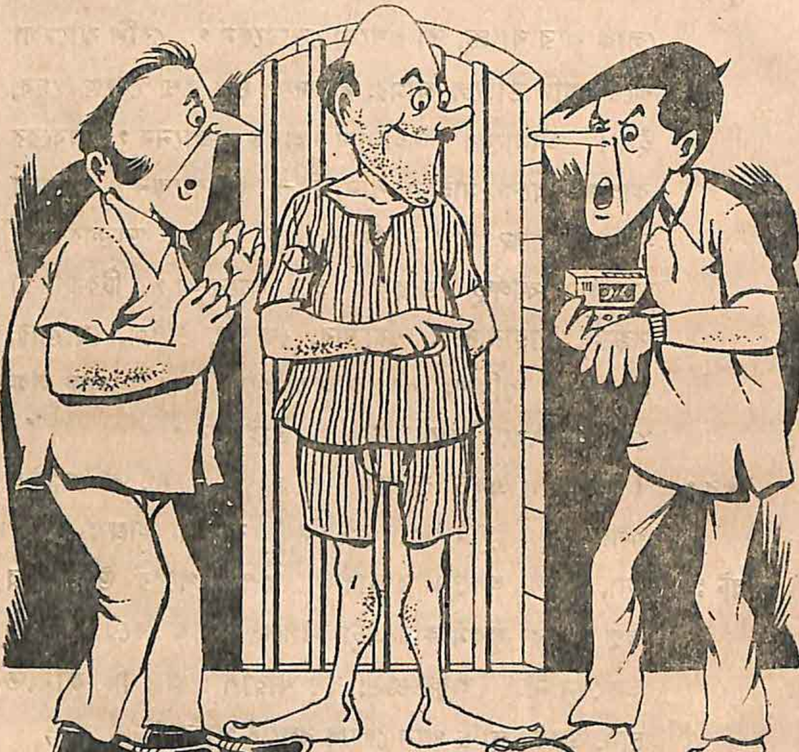
ঘটু : 'হ্যাঁ, পথে আসুন বাছাধন। স্রেফ পরের উপকারের জন্য আমরা কুকর্ম করি এটা কাগজে ফলাও করে লিখতে ভুলবেন না। অকৃতজ্ঞতা বড় খারাপ। আর কি জানতে চান, একটা ছাঁচি পান পেলে বলতে পারি।'

(ডাক্তারবাবুর কৌটো থেকে ছাঁচি পান প্রদান)

শিব : ইয়ে—মানে শরীরটরীর ভালো থাকে তো ?

ঘটু : থাকবে না-ই বা কেন ? সুপারিনটেণ্ডেণ্টের ফুল বাগানে কাজ করি। ছোটবেলার শখ। বাবা ছিল মালী। তা বৌ লাউ-কুমড়ো ছাড়া কিছু ফলাতে দেবে না। এখানে

আমার গোলাপ বাগিচাটে দেখে আসুন। চক্ষু সার্থক হবে। মাইনে পাই। একমাত্র দুঃখ আর ১৫ দিন বাদে কুঁড়িগুলো ফুটতে শুরু করবে, ঠিক তখনি আমার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।—আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, আমি যদি এনার হাতঘড়িটে ছিনিয়ে নিই, তাহলে মেয়াদ বাড়বে না?



ডাক্তার : না, না, ও কি কথা! আমি বরং তোমাকে ওঁর প্রাইভেট মালীর কাজ পাইয়ে দেব। কিন্তু ও কি সব উটকো কথা বলছো বাপ? বয়স হচ্ছে, ঘটু, দুষ্কর্মের পথ ছাড়ো। আজকাল ওষুধ বেরিয়েছে। তাই খেলে কুকর্মের ইচ্ছাই চলে যায়।

ঘটু ঃ ও, খবরের কাগজ-মশাই, দেখছেন তো কি নির্বান্ধব পুরীতে থাকি, কারো ওপর ভরসা করতে পারি না। লিখবেন আমাদের দুঃখের কথা। আপনিও আমাকে দুষ্কৃতকারী বলে ঘেন্না করছেন নাকি?

শিব ঃ না, না ছি, কি যে বল। আমি বরং এবার উঠি। আমারো নীতিজ্ঞানটুকু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কাসুন্দি দিলে লপসি আরো ভালো লাগতে পারে মনে হয়।

এই বলে কাসুন্দির নতুন শিশিটা ঘটুকে দিয়ে শিবশংকর ভারি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আপিসে ফিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খাসা একটা স্কূপ লিখেও ফেলল। তার টাইটেল দিল 'দুর্নীতির উল্টো পিঠ'। দুঃখের বিষয়, সম্পাদক মশাই মন দিয়ে সবটা পড়ে বললেন—'এ সব সত্যি কথা কখনো ছাপানো যায়? তুমি কি আমার চাকরি খেয়ে নিতে চাও নাকি, এ্যাঁ? না না, ঐ বইমেলাটেলাই তো বেশ ছিল। এ-সব দুর্বুদ্ধি ছাড়ো!' যাচ্চলে।

অশরীরী

এখন আমি একটা সাধারণ খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও, এক বছর আগেও একটা সাংঘাতিক গোপনীয় কাজ করতাম। সে কাউকে বলা বারণ। বললে আর দেখতে হত না, প্রাণটা তো বাঁচতই না, তার ওপর সব চাইতে খারাপ কথা হল যে, চাকরিটাও চলে যেত। তবে এটুকু বলতে দোষ নেই যে, কাজটা ছিল খবর সংগ্রহ করা। কোথায়, কেন, কার জন্য সে-সব তোমরাই ভেবে নিও।

আমার বয়স তখন ২২ ; নামটা আর বললাম না। আমাদের পাড়ার হরিশ খুড়ো চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনেই আমার বড়-সায়েব—সায়েব হলেও তিনি কুচকুচে কালো—আমাকে বলেছিলেন, "দেখ, সর্বদা 'নেই' হয়ে থাকবে। তুমি আদৌ আছ সে-কথা টের পাওয়া গেলে চলবে না। তোমার আলাদা একটা চেহারা, কিম্বা চলা-ফেরা, কিম্বা কথা-বলার ধরন গজালেই চাকরিটে যাবে। পানা-পুকুরে এক ফোঁটা ময়লা জল হয়ে থাকবে ; সমুদ্রের ধারে এক কণা বালি হবে ; এক কথায় স্রেফ অশরীরী হয়ে যাবে। কথা বললে কী বলছ বোঝা যাবে ; কিন্তু আলাদা করে গলার আওয়াজ মালুম দেবে না। আর সব চাইতে বড় কথা হল যে, নিজের চেহারা বলে কিচ্ছু রাখতে পাবে না, যাতে তুমি মরে গেলেও তোমাকে সনাক্ত করা না যায়। ও-রকম করে তাকাচ্ছ কেন, এ কিচ্ছু শক্ত কাজ নয়, কিছু করতে হবে না, স্রেফ নেই হয়ে থাকতে হবে। বেশি লেখা-পড়া

জানারও দরকার নেই। বলো, পারবে তো?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।"

বড়-সায়েব বেজায় রেগে গেলেন, "ফের কথার ওপর কথা! চুপ করে থাকতেও কি শেখাতে হবে নাকি? কী নাম তোমার?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

বড়-সায়েব খুব খুশি হয়ে বললেন, "খুব ভাল। মাইনে নেবার সময় নাম লিখবে না, টিপ-সই দেবে না। নাম ভাঁড়ানো যায়, কিন্তু টিপ-সই দিয়ে সবাইকে চেনা যায়। ছুনিয়ার কোনো ছুজন লোকের এক রকম আঙ্গুলের ছাপ হয় না। ১লা তারিখে আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাবে, খাতায় লেখা হবে 'নষ্টামি বাবদ ছুই শো টাকা'। আচ্ছা, যেতে পারো।"

আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে তিনটে আঙুল দেখালাম। বড়-সায়েব হেসে বললেন, "আচ্ছা, তিন শো টাকাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, বিপদে পড়লে আমরা বলব তোমাকে চিনি না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শুনলাম আমার নতুন নাম ইংরিজি হরপের 'কিউ'। যেখানে যত সন্দেহজনক খবর শোনা যেত, নিজে দেখে এসে আপিসের পাশের গলিতে ভাঙা টাইপ-রাইটার ভাড়া খাটত, তাতে টাইপ করে জমা দিতে হত। তারপরের ছয় মাসে কোথায় যে না গেলাম, কী যে না দেখলাম, তার ঠিক নেই। অথচ আমাকে কেউ দেখতে পেত না। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে এক্কেবারে মিলিয়ে যেতাম। যেখানে ভিড় নেই, শুধু ভাঙা দেয়াল, সেই দেয়ালে একটা দাগ হয়ে মিশে থাকতাম। একবার একটা চোরাই গুদোমে সারাদিন শ্রমিকদের একজন হয়ে গিয়ে রাশি রাশি গোপন খবর এনে দিয়েছিলাম। বড়-সায়েব খুশি হওয়ায় মাইনে বেড়ে গেছিল। আরেকবার একটা বিদেশী মাল-জাহাজে সারাদিন একটা পিপে হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা খুঁজিয়ে পাইয়ে দিলাম। সেইজন্য খবরের

কাগজে বড়-সায়েবের সে কী প্রশংসা!

সে যাই হক, শেষবারের কাজটার কাছে ও-সব কিছু না। নাকি গড়িয়ার দিকে এতকাল কোনো বে-আইনী কাজ হয়নি, তাইতে সকলের সন্দেহ হল, নিশ্চয় কোনো গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। তার ওপর সব বাংলা কাগজে যখন ছোট্ট একটা নোটিস বেরুল—টিপ বোতাম পরিষদের প্রথম সভা গ-শু-৭, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে গড়িয়াতে, শুক্রবার সাতটায় গোপন সভা বসবে।

বড়-সায়েবের ঘর থেকে প্রায় অদৃশ্যভাবে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাঁর পেয়ারের বেয়ারা বলল, "টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেবে না।"

রুমাল জড়িয়ে হাত পাতলাম। সে এক কুচি লাল কাগজ বের করে বলল, "দু টাকা।" একটা আঙুল দেখালাম। তাকে টাকা দিয়ে টিকিট পকেটে ফেলে চলে এলাম।

শুক্রবার পাঁচটায় যখন বাসে সব চাইতে ভিড় হয়, তখন, বেছে বেছে সব চাইতে ভিড়ের বাসে উঠলাম। উঠে চারটে লোকের মধ্যিখানে এমন 'নেই' হয়ে রইলাম যে, কণ্ডাক্টর টিকিট চাইল না। চাইবে কেন, আমার তো আর শরীর-টরীর নেই যে বাসের জায়গা জুড়ে থাকব।

গড়িয়াতে নেমেই একটা চায়ের দোকানে ভিড় দেখে, সটান সেখানে গেলাম। এক ভাঁড় বেজায় হালকা, বেজায় গুড়ের চা নিয়ে, তক্তার ওপর দশ পয়সা ফেলে দিলাম। সস্তা তো হবেই, শুকনো শালপাতা দিয়ে এ-সব চা বানাতে হয়, চা-পাতা দিলে আর ঐ দামে দিতে হত না।

ভাঁড় নিয়ে একটা বাঁশের খুঁটির পিছনে গুম্ হয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে হাসাহাসি হচ্ছিল, ঐ শুক্রবার নিয়ে নাকি চারদিন পকেট-মার হয়নি। চট্ করে বুঝে নিলাম সভা তাহলে পকেট-মারদের। একটা চিমড়ে লোক চায়ের ভাঁড় শেষ করে, সামনের বাঁশ বাগানের দিকে পা বাড়াতেই, বাকি সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল—"ও মশাই অমন কাজও

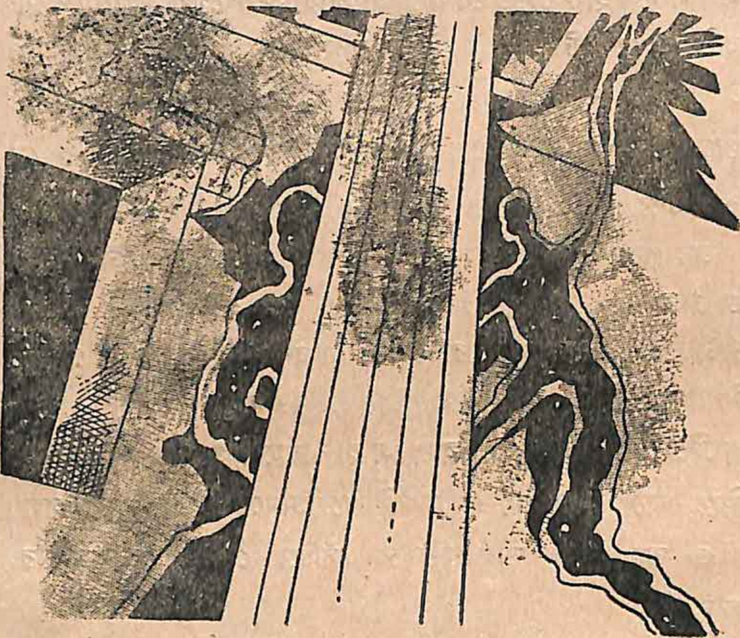
করবেন না। ঐ বাঁশ বাগানের পথ দিয়ে একটি মাত্র জায়গায় যাওয়া যায়, সেটি হল গোরে-বাড়ির ভাঙা কেল্লা, ভূতদের থান! দিনের বেলাতেও ও-পথে কেউ যায় না। কাগ-চিল, কুকুর-বেড়াল-ও না।"

লোকটা ভয়ে-ভয়ে ইদিক-উদিক তাকিয়ে উল্টো দিকে মাঠের পথ ধরল। সকলে হাঁফ ছেড়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল। আমিও সেই সুযোগে ঐ লোকটির পিছন-পিছন চললাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মাঠ ভেঙে ঘুরে সে আবার বাঁশ বাগানের ওপারে, সেই রাস্তাটাই ধরল। আমি তার পিছনে 'নেই' হয়ে চললাম। শুকনো পাতার ওপর এতটুকু পায়ের শব্দ হল না, নইলে এতদিন কী শিখলাম।

তার পরেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। সামনেই একটা প্রকাণ্ড ভাঙা কেল্লা। সেখানে পৌঁছে পথটাও শেষ হয়ে গেছে। কেল্লার চুড়োটা শুধু দেখা যাচ্ছে, চারদিকে এমনি ঘন বন হয়ে গেছে যে তার বেশি কিছু ঠাওর হল না। লোকটা একটুও দাঁড়াল না, সটান বনের মধ্যে দিয়ে সেঁধিয়ে গিয়ে, কেল্লার লোহা-বাঁধানো প্রকাণ্ড সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশে ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে সেঁধিয়ে গেলাম, সে কিছু টেরই পেল না।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ, তার ও-ধারেই মস্ত ঘরে সভা বসেছে। সে কী ভিড় আর কী ভয়ঙ্কর তর্কাতর্কি! ঘরে একটা জানালা নেই, উঁচু ছাদে কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস আসে, তাও এমন আড়াল করা যে, বাইরে এক বিন্দু আলো যাচ্ছে না। যদিও ঘরে কয়েকটা ডে-লাইট বাতি জ্বলছে, তাতে ঘরের অন্ধকার কাটছে না, ঘুপচি-ঘুপচি ভাব, একটা সোঁদা গন্ধ, পায়রার নাকি বাদুড়ের বা অন্য বিকট কিছুর, কে বলতে পারে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে যেতে-যেতে বুঝলাম যে, কেউই আলো চায় না, কারো মুখ চেনা যাচ্ছে না; সকলের একরকম কাপড় চোপড়, চেহারা, ঘাড় গুঁজে বসার আর আড়-

চোখে চাওয়ার অভ্যাস। এদের সঙ্গে আমার এতটুকু তফাত নেই দেখে, নিশ্চিন্তে অদৃশ্যভাবে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে। বেরুবার পথ ঐ একটি, আর সব বন্ধ, হয়তো একশো বছর খোলা হয়নি, খোলা যায়ও না।



ফ্যাশফেঁশে বেড়ালে গলায় যা বলা হচ্ছিল তার কতক কতক বুঝতে পারলাম। এরা ইউনিয়ন করতে চায়, কিন্তু শত্তুরদের জ্বালায় কিছু হয়ে উঠছে না। আজকের ঐ কুখ্যাত নির্জন জায়গায় কারো অনধিকার প্রবেশের কোনো সম্ভাবনাই নেই— হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা থামের পাশের সব চাইতে অন্ধকার কোণ দিয়ে সর-সর করে কেউ ছাদের অস্পষ্টতা থেকে নেমে এসে, আমার থামের ও-পাশে দাঁড়াল। আমার গা শিউরে উঠল।

বক্তা তাঁর সরু-সরু হাত-পা নেড়ে বলে চললেন, "সাধারণ

নাগরিকদের অধিকার থেকে কেন আমাদের বঞ্চিত করা হবে? জনতা থেকে আমরা অভিন্ন। আলাদা করে চিনুক তো কেউ! বলুক দেখি আমরা কেমন দেখতে, কেমন গলার আওয়াজ! আমাদের—"

আমার গা শিউরে উঠল! আরো গোটা দশেক ছায়া ছায়া মতো এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে বেরিয়ে এসে, আবছায়াতে মিশে রইল।

বক্তা একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমাদের একটা আস্তানার দরকার ছিল, এর চাইতে ভাল আস্তানা কোথায় পাওয়া যাবে? আমরাই তো আসল অশরীরী, সকলের চোখের সামনে কাজ করি, কেউ আমাদের দেখতে পায় না। এই ছোট ইটের টুকরো ফেলে আজ এখানে আমাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা—"

এই অবধি বলে ইটটা হাতে করে তুলেছে, অমনি ঘরে একটা সোরগোল উঠল, "না, না, না, না—", তারপরেই মনে হল ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে পঁচিশ-ত্রিশটা ছায়া-মূর্তি বক্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি অদৃশ্যভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বক্তা একটা কোঁক শব্দ করে বসে পড়ল।

হঠাৎ বক্তার পাশে বসা ছুঁচোমুখো একটা লোক গর্জন করে উঠল, "নটে! ভজা! কাতিক! কী, কাচ্ছিস্‌টা কী? কই সমঝা!"

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য ভাব ছেড়ে দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক ছোকরা খালি হাতেই মঞ্চের ওপর উঠে পড়ে, ওরে বাবারে, সেই ছায়া-মূর্তিগুলোকে পেল্লায় পেটাতে লাগল! সেই ফাঁকে বক্তা উঠে পড়ে দে দৌড়।

আমি এমন পেট্‌নাই জন্মে দেখিনি। আগন্তুকদের আগা-পাশ-তলা ধাঁই-ধড়াক্কা মার! তার মধ্যে কে রব তুলল, "ব্যাটারা সব পুলিশের চর, অশরীরী সেজে এয়েচেন! লাগা! লাগা! ভজা দেখছিস্ কী?"

ভজা বলল, "পেছলে যাচ্ছেন যে!"

শেষটা তাদের পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেই হল। সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে মঞ্চ থেকে

নেমে, স্রেফ জলের স্রোতের মতো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গলে, ঘরের একটি মাত্র দরজা দিয়ে, সব নিমেষের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। ধন্যি পুলিসের ট্রেনিং !

হয়তো একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখবার জন্য বোধহয় ভিড় থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা হয়ে পড়েছিলাম। কারণ পালাতে-পালাতে শেষের লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে একরকম কোল-পাঁজা করে তুলে ধরে বাইরের জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলে বলল, "চঁলে চঁল্ ! চঁলে চঁল্। দেঁখ্ছিস্ কঁী !"

বলে একটা শ্যাওড়া গাছের ডাল বেয়ে উঠে পড়ল। ততক্ষণে ডে-লাইট হাতে নিয়ে নটে ভজারাও দোরগোড়ায় দেখা দিয়েছে। সেই আলোতে দেখলাম, যে লোকটা গাছে চড়ছে, তার গোড়ালি দুটো সামনের দিকে ! তক্ষুণি গাছ-গাছড়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে মুচ্ছো গেলাম। ওরা বোধহয় আমাকে খুঁজে পায়নি। অবিশ্যি আমি যে আছি, তাও ওরা জানত না। খুঁজবে কাকে ?

বড়-সায়েবের কাছে আর যাইনি। আজকাল খবরের কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করি। অবিশ্যি একেবারে 'নেই' হয়ে।

'ননে'

তোমরা মনে করতে পার বোকারাই শুধু পরোপকার ক'রে থাকে, কিন্তু ননে বলেছে আসলে মোটেও তা নয়। সে এক মস্ত কাহিনী, কিন্তু যারা অমন অন্যায় কথা বলে থাকে আর যারা সেটা আবার বিশ্বাস করে থাকে, তাদের সকলের জানা উচিত।

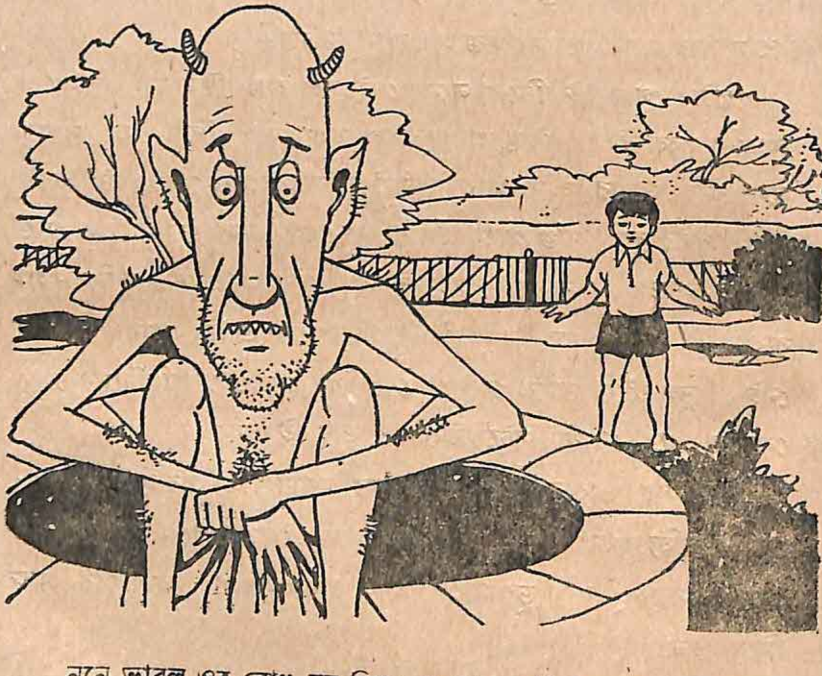
গল্পটার গোড়ায়ই ছিলো ননের সেই ভুল অঙ্ক তিনটে। এদিকে ভুল তো সব্বারই হয়, কিন্তু বাবা কি তা বুঝবেন? দিদি যে মেজদা মনে করে দাদার বন্ধুর মাথায় চাঁটিয়েছিলো, সেও তো একটা ভুল। বাবা অরুণবাবুর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে গয়া থেকে চলে এসেছিলেন, সেও তো একটা ভুল। ননের বেলাতেই যত দোষ! এ সব জিনিস বলা যায় না। / কোন্ অঙ্ক কখন ঠিক হয় তার তো একটা ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ভুল হ'লে তাকে ঠেকাবে কে? বীরেনদাও তো দিদিদের চায়ে নেমন্তন্ন করে কোথায় সট্‌কেছিলো; ভুল বইত নয়।

এই সব ভাবতে ভাবতে গাছের ছায়াগুলো সব লম্বিয়ে এল; শেষটা সূয্যি কখন তালগাছগুলোর মাথার উপর থেকে সরসর করে নেমে এসে টুপ্ করে ডুব মারল, আর ছায়াগুলোও অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল।

ঝড়ুর সেই গল্পটা মনে হতে লাগলো। ঝড়ু বলেছে পুরোন কুয়োর পাশে যে মস্ত গাছ সেখানে আগে থাকত এক ভূত, তার রোগা দেহ সুঁটকো ঠ্যাং নিয়ে। ঝড়ু বলেছে, "হোবে না সুঁট্‌কো, তোরকারী সীম কুচ্ছু খাবে না, "হোবে না ও রকম!" যাক সুঁট্‌কো ভূত অনেকদিন ধরে থাকৃতো; শেষটা হঠাৎ একদিন চাঁদনি রাতে

কুয়োর কালো জলে নিজের ছায়া নিজে দেখে বিশ্রী ভয় পেয়ে সেই যে পিট্টান দিল, কোথায় গেল তার আর লেখাযোখা নেই।

আজ রাত্তিরে কুয়োর দিকে তাকাতেই ননে আঁৎকে উঠল—ঐ তো কুয়োর পাড়ে ঠ্যাং ঝুলিয়ে স্থুঁট্কো-চেহারা বসে আছে। ওর চুল আঁচড়ানো নেই, চাঁদের আলোতে ওর কপালের ঢিব্লি দুটো চক্চক্ করছে, নাকের ডগাটা লালমতন। ওর সর্দি হয়েছে, দু'তিনবার নাক টানল, তার শব্দ ননের কানে গেল। ননের ওকে ভালো লাগল।



ননে ভাবল ওর বোধ হয় কিছু দরকার, তাই অমন গোমড়ামুখে বসে আছে। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে কানে কানে বলল, "স্থুঁট্কো তুমি কি খুঁজছ?" সে বোধ হয় একটু বিরক্ত হ'য়ে বলল, "আমার নাম গোরা। আমার জামা ছেঁড়া, আমার পেটে ক্ষিদে, চোখে ঘুম। পারো দিতে এসব?" ননে বলল, "তুমি কি আমাকে বোকা ঠাউরেছ?

কেন পারব না?" স্থঁট্‌কো তাতে বলল, "তা হলে এখন কেটে পড়, কে কোথা দেখবে! আরও রাত হলে এনে দিও কিন্তু।" তাই ননে সেখান থেকে চলে এল। রাত্রে সকলে খেতে বসলে ননে ছেঁড়া তোয়ালে দিয়ে পুঁটলি বানাল; তার মধ্যে ছিল জামা, চটি ও খাবার জিনিস। পুঁটলি কাঁধে কুয়োর পাড়ে গিয়ে দেখল, স্থঁট্‌কো সেখানে নেই। দশ মিনিট অপেক্ষা করলে পর স্থঁট্‌কো এল; তাকে পুঁট্‌লি দিয়ে ননে বলল, "কোথায় গেছিলে? আমি এতক্ষণ গাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে আমার গায়ে পিঁপড়েরা হাঁটাহাঁটি করছিল।" স্থঁট্‌কো পুঁটলি নিয়ে বলল, "ঠেসান দিলে কেন? গাছে ঠেসান দিতে নেই।" বলেই কোথায় চলে গেল। ননে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তার আর পাত্তাই নেই। শেষটা ভাবল সে বোধ হয় পুঁট্‌লি নিয়ে ভুষুণ্ডির মাঠে চলে গিয়েছে।

এই তো গেল পরোপকারটার কথা। তারপর কদ্দিন ননে কুয়োর দিকে যাওয়া আসা করছে, স্থঁট্‌কো আর আসে নি। কোথায় ভেগেছে কে জানে! ননে ভাবল, সত্যিই তো পরের উপকার কখনও করতে নেই!

ইতিমধ্যে বছরটা শেষ হতে চলল। পৌষের শেষে পিঠে খাওয়া হল, মাঘ মাসে গেল সরস্বতী পুজো, ফাল্গুন গেল, দোল গেল, চৈত্রমাস পর্যন্ত এল। কুয়োর পাড়ে গাছটির পাতা শুকিয়ে, ঝরে, নতুন গজিয়ে, আবার বড় হতে চলল! এ বছর কিছুই জমছে না। সরোজটাও মাষ্টার মশাইকে ঠেঙ্গিয়েছিল বলে তাকে ইস্কুল থেকেই ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই আর পাখি টাখি পোষা হয় নি, মাছ ধরবার ছিপও তৈরি হয় নি। স্থঁট্‌কো সেই যে গেছে তো গেছেই, সে কি আর ফিরবে!

এই সময়ে একদিন বুটপরা কে একজন এসে উপস্থিত হল; বলল, "আমাকে ভুলে গেছ? সেই যে পুঁট্‌লি দিয়েছিলে! চটিটা

অবশ্য কিচ্‌কিচ্‌ করত, জামার বগল ছেঁড়া, তবু তো দিয়েছিলে, তাড়িয়ে তো আর দাওনি, তাই তোমার কথা প্রায়ই ভাবি।”

ননে এতক্ষণে স্ক্রুটকোকে চিনল, সে আর এখন সে স্ক্রুটকোটি নেই! সে আরও বলল, “তোমায় আর কি দেব, এই মাদুলীটা নাও, তা হলে তোমার ব্যামো হবে না, পরীক্ষা পাশ করবে, লটারি জিতবে, গোরু তাড়া করবে না, এমন আরও কত কি! কিন্তু সাবধান, যদি ওটাকে দৈবাৎ টিকটিকিতে চাটে, ওর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে!” এই বলে সে চলে গেলো।

এমনি করে ননে পরোপকারের ফল পেলো। অবিশ্যি তার পরেও ননেকে অনেক ব্যামোয় ভুগতে হয়েছিল, অনেক গোরুর তাড়া খেতে হয়েছিল। কিন্তু সে বোধ হয় মাদুলীটাকে কেউ যখন দেখছিল না, তখন হয়তো টিকটিকিতে চেটেছিল।

যাই হোক্‌, এটা নিশ্চিত যে পরোপকার করাই ভালো।

কার বেশি দাম ?

বিদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা দেশ-বিদেশের অতি প্রাচীন জিনিস আবিষ্কার, উদ্ধার আর রক্ষা করার কাজে অনেক সাহায্য করেন। তাই অনেক সময় কিছু মূল্যবান ছবি, মূর্তি বা বাসনপত্র তাঁদের উপহার দেওয়া হয়। সেই সব জিনিস তাঁরা নিজেদের দেশের যাদুঘরে বা প্রদর্শনী-গৃহে সাজিয়ে রাখেন, যাতে জনসাধারণ দেখে আনন্দ আর শিক্ষা দুই-ই পায়। মূল দেশও সম্মান পায়।

ঐ সব প্রত্নতাত্ত্বিকরা কত সময় প্রাণ হাতে করে, ঘোর জঙ্গলে তাঁদের অনুসন্ধান চালান। অন্য কষ্টের কথা তো ছেড়েই দিলাম। আর শুধু বিদেশী পণ্ডিতরা কেন, আমাদের দেশেও এমন কিছু দুঃসাহসিক উৎসাহী মানুষ আছে, যারা লাভের কিম্বা রোমাঞ্চের আশায়, নানা দুর্গম জায়গায় কত রকম বিপদের সম্মুখীন যে হয়, তার ঠিক নেই। সকলেই জ্ঞান বাড়াবার জন্যে যায় না সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ছোট ছোট একেকটি পাথরের, কি হাতির দাঁতের, কি সোনা-রূপোর জিনিস ঠিক জায়গায় পড়লে, লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। বহু লোক সেই আশাতেই যায়।

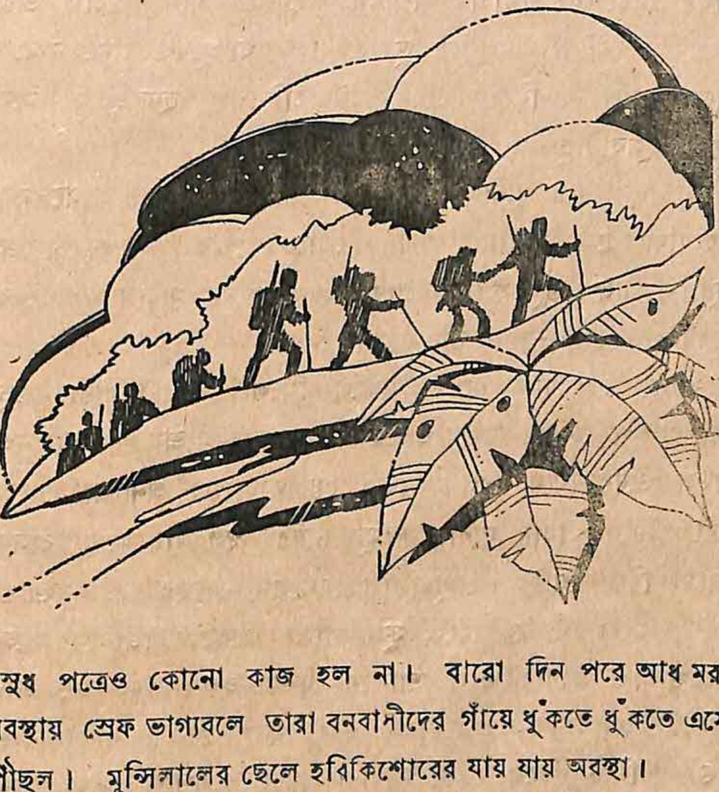
এসব ব্যাপারে সরকারী অনুমতি নিতে হয়। লোকজন হাতিয়ার রসদ তাঁবু ওষুধপত্র সব নিয়ে মেলা খরচের দায়েও পড়তে হয়। তেমনি কপাল খুলে গেলে কথাই নেই। একেকটা দলে দু-তিনজন সত্যিকার অনুসন্ধানকারীও যেমন থাকেন, তেমনি কিছু ব্যবসাদারও স্রেফ ঐ লোভের কারণে জড়িয়ে পড়েন। হয়তো নিরক্ষর গ্রাম-বাসীদের মুখে দু-চারটে গুজব শুনেছেন। কিংবা কোনো মূল্যবান

প্রাচীন জিনিস তাদের কাছে দেখেছেন। কিনেছেনও হয়তো দুটো-চারটে। মোট কথা এটুকু বুঝেছেন যে এটাকে একটা মস্ত লাভের ব্যবসা করে তোলা যায়।

বুড়ো মুন্সিলাল এই রকম একজন ব্যবসাদার। সৎ, কিন্তু ধনের উপর বড় লোভ। তাঁর ছেলে হরিকিশোর-ও লোভী, কিন্তু অত সৎ নয়। হরি একদিন তার বন্ধু রতনলালকে নিয়ে এসে এক অদ্ভুত গল্প বলল। গল্পের প্রমাণস্বরূপ গোটা দুই সবুজ পাথরের ছোট ছোট ধূপদানিও দেখাল। নাকি ভারতের উত্তর-পূবের সীমান্তের কাছে ঘন জঙ্গলে দু-এক গ্রাম বনবাসী ছাড়া শুধু হিংস্র জানোয়ার বাস করে। ঐ সব বনবাসীদের মুখে শোনা সেখানে এক আশ্চর্য ঝরণা আছে। পাহাড়ের বহু উপর থেকে তার জল পড়ে পড়ে নিচে একটা গভীর পুকুর তৈরি করে ফেলেছে। তাতে নাকি হিংস্র অজানা জলজন্তুও আছে। কিন্তু মাঘী পূর্ণিমায় সারা দিন উপোস করে কেউ যদি ঘোর রাতে, নিশ্বাস বন্ধ করে তলা পর্যন্ত এক ডুব দিয়ে হাতে যা ঠেকে, সেটাকে তুলে নিয়ে আসে, তাহলে সে বড়লোক হয়ে যাবে। তার প্রমাণ ঐ দুটি ধূপদানি।

হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়েও হাসতে পারলেন না মুন্সিলাল, কারণ তাঁর জহুরীর চোখ বলল ও দুটি পান্না ছাড়া কিছু নয়। এর মতো দামী জিনিস দুনিয়াতে কিছু নেই। এর জন্যে লোকে প্রাণ দেয়। মোট কথা শেষ পর্যন্ত মুন্সিলালের খরচে ছোট খাটো একটি দল তৈরি হল। খোঁড়াখুঁড়ি যখন হবে না, অনুমতি তো দরকার নেই; প্রত্নতত্ত্ববিদেরো দরকার নেই; কাউকে বলবারো দরকার নেই; গোপনে জনা-আষ্টেক বিশ্বাসী লোক রওনা হয়ে গেল। তাদের মধ্যে মুন্সিলাল নিজেও ছিলেন। খাবার দাবার, অস্ত্রশস্ত্র সব-ই ছিল। ছিল না শুধু জায়গাটার কোনো মানচিত্র। নাকি ঐ অঞ্চলের তখনো জরিপ-ই হয়নি। তবে ছোট এলাকা; একেবারে গোরু খোঁজা করে ফেলতেও

অসুবিধা নেই। কিন্তু যেমন ভাবা যায় সব সময় তেমন হয় না। দলের মধ্যে বিশ্রী এক রকম জ্বর দেখা দিল। তিন দিনের পথ পার হতে সাত দিন লেগে গেল। খাবার দাবার ফুরলো, সঙ্গের



ওসুধ পত্রেও কোনো কাজ হল না। বারো দিন পরে আধ মরা অবস্থায় স্রেফ ভাগ্যবলে তারা বনবাসীদের গাঁয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পৌঁছল। মুন্সিলালের ছেলে হরিকিশোরের যায় যায় অবস্থা।

বনবাসীরা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস নিয়ে গাছের ওপর কুটির বেঁধে থাকে। কিন্তু নিচের ঘরে ঢুকে অভিযাত্রীদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সোনা রূপোর জিনিস অযত্নে পড়ে আছে। ওপরে না জানি কি আছে! কিন্তু সেখানে ওঠার ক্ষমতা ছিল না কারো। হরিকিশোর বাঁচলে হয়।

বাঁচল হরিকিশোর। বনবাসীদের টোট্কা ওষুধে সকলেই সুস্থ

হল। মোড়ল মুন্সিলালকে ওপরে নিয়ে গেল দু-দিন পরে। মুন্সিলাল ভাবলেন না জানি কি দেখবেন। দেখলেন শুধু ছেলে পুলে, বুড়ি মা-ঠাকুমা। শুকনো খাবার জিনিস, টোট্‌কা ওষুধপত্র। এই তাদের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। নেমে এসে অবধি তাঁর মুখে কথা নেই। ধনপুকুরে ডুব দেবার কথা মুখেও আনলেন না। মোড়ল বলল যে নিচের ঘরের জিনিস যদি কিছু পছন্দ হয় তা নিয়ে যেতে। সবাই চুপ।

সাতদিন পরে মুন্সিলাল ফিরবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। বনবাসীরা বনের সীমানা অবধি পৌঁছে দেবে। কাপড়চোপড়, ওষুধপত্র, টাঙ্গি কুড়ুল ইত্যাদি প্রাণধারণের জিনিস মুন্সিলাল তাদের দিয়ে দিলেন। ও-সবের তাঁর দরকার নেই।

ধনপুকুরও দেখে এলেন, সকলে মিলে। মোটা ধারায় উঁচু থেকে জল পড়ছে। ঝরণার ওপরে নাকি লামার আশ্রম। সেখানেও মোড়ল ওদের নিয়ে গেল। বোধ হয় পাহাড়ের অন্য পার থেকে যাত্রীরা এসে খাবার দাবার, ফলমূল, চাদর কম্বল আর রুপোর বাসন প্রণামী দিয়ে গেছিল। মুন্সিলাল দেখলেন কাজের জিনিসগুলো সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, ফুল পাতা অকেজো জিনিসের সঙ্গে বাসনগুলোও ঝরণার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। এই তবে ধনপুকুরের রহস্য। ফালতু জিনিস এঁরা ফেলে দেন। বনবাসীরাও সেগুলো নিচে ফেলে রেখে খাবার দাবার ছেলেপুলে নিয়ে ওপরে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করে।

মুন্সিলালের মূল্যবোধ কেমন গুলিয়ে গেল। দলের লোকরা যদি বা বনবাসীদের দেওয়া দুটো একটা জিনিস নিল, তিনি হরিকিশোরকে নিয়ে খালি হাতে কৃতজ্ঞ চিত্তে ফিরে এলেন।

সেজ-বুড়োঠাকুরদার সাফল্য

শোন—শিবুর সেজ-বুড়োঠাকুরদার সাফল্য। অবাক হলে নাকি? তা ঐ হল গিয়ে এ গল্পের নাম। শিবু ছিল আমাদের পাড়ার ছেলে। রোগা লম্বা কালো। মুখটা সর্বদা হাসি-হাসি। পড়াশুনোয় খুব একটা ভালো না। বিশেষত অংকে। তবে মনটা ভালো। জীবজন্তু ভালোবাসত; পোকাটোকা পুষত; ঠাকুমার বরাদ্দ দুধ থেকে লুকিয়ে খানিকটা ঢেলে নিজের পোষা কুকুর খেঁকিকে খাওয়াত। না খাইয়ে করবেই বা কি? নেড়িকুত্তোর জন্যে দুধ চাইতে গেলে কে দিচ্ছে! শুধু তাই নয়। সুযোগ পেলেই শিবু বন-জঙ্গলে ঘুরত। অদ্ভুত সব পাখিজুখি, গাছগাছড়া, ইঁদুর-প্যাটার্নের জীবজন্তু নিয়ে ফিরত। এর বাড়িতে ওর বাড়িতে বন্ধুদের কাছে রাখত। বাড়ির লোকেরা চটে কাঁই হত। তারা একটু অদ্ভুত ছিল।

অংকে কাঁচা, অথচ বিজ্ঞানী হবার শখ। বোঝ একবার। আমাদের বাড়ির জাপুর সঙ্গে শিবুর ভারি ভাব। এ-সব আশ্চর্য কথা জাপুর কাছেই শোনা; নইলে জানব কি করে। তা শিবু বলত, 'অংকটা শিখে নেব দেখিস্। কিন্তু বিজ্ঞানের আসল জায়গা মোটেই সায়েন্স কলেজে কিংবা অন্য কোনো গবেষণাগারে নয়। বন-জঙ্গল থেকে সন্ধানীরা যে-সব তথ্য আর সামগ্রী নিয়ে আসে, গবেষণাগারের কয়েকটা লোক, শহরের বাইরে এক পা না গিয়ে, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করে ডক্টরেট পায়। আমি অংকটা একটু রপ্ত করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানী হব। সেজ-বুড়োদাদু বলেছেন অনুসন্ধানীদের অনেক ওপরে সন্ধানীদের স্থান।'

জাপু শুনে হাঁ। 'কিন্তু সেজ-বুড়োদাদু আবার কে?' 'কেন, আমার ঠাকুরদার সেজ কাকা ছাড়া আবার কে?' জাপু এমনি অবাক হল যে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল, 'তোর ঠাকুরদাই তো যথেষ্ট বুড়ো, রাতে দুধ-খৈ খান। তাঁর আবার সেজকাকা হবে কোত্থেকে?' শিবু বেশ বিরক্ত, 'ঠাকুরদা যদি বুড়োই হন, সেটাও কি সেজ-বুড়োদাদুর দোষ? তাহলে সবটা শুনলে না জানি কি বলবি?' বাকিটা শিবুর মুখেই শোনা ভালো। 'ঠাকুরদা রাতে দুধ খৈ খেতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন যে লোকে তাঁর সেজ-কাকার নাম জানুক আর না-ই জানুক, আর্যভট্টর পর তাঁর মতো বৈজ্ঞানিক ভূ-ভারতে জন্মায়নি। দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের সব পেপারে প্রায় পুরো নম্বর পেয়েও মৌখিক পরীক্ষায় দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের ভুল ধরিয়ে-টরিয়ে এমন বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করেছিলেন যে কোনো গবেষণাগারে তাঁর জায়গা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই। বাড়ির লোকরাও তাঁর ব্যবহারে চটে লাল। ঠাকুরদার চেয়ে তাঁর কাকা সামান্য বড় ছিলেন। কিন্তু কাকার হয়ে কিছু বলার সাহস ছিল না তাঁর। কাকাও একটু কেমন যেন। সে যাই হক কোথাও যখন কড়ি পেলেন না, তখনো কাকার এতটুকু লজ্জা বা দুঃখ দেখা গেল না। পৈত্রিক বাড়ির চিলেকোঠাটাকে নিজের কর্মস্থল বলে বেছে নিলেন। মাঝে মাঝে গাম-বুট পায়ে, গাঢ় কালচে-সবুজ শার্ট পেন্টেলুন গায়ে, মাথায় খাকি টিনের হ্যাট আর পিঠে হ্যাভারসাক নিয়ে যত রাজ্যের বুনো-জন্তু অধ্যুষিত বনে মাসের পর মাস অদৃশ্য হয়ে যেতেন। হঠাৎ হঠাৎ ফিরে চিলে-কোঠায় আস্তানা করতেন। সঙ্গে সর্বদা তাঁর পোষা দাঁড়কাক নারদ থাকত। তাকে কথা বলতে শিখিয়েছিলেন। তার হাঁকডাক শুনে বাড়ির লোক টের পেত চাঁদ ফিরেছেন। তখন বুড়ো বামুনঠাকুর চার বেলা তাঁর ভাত জলখাবার দিয়ে আসত।

মাঝে মাঝে নিচে নেমে সকলের সঙ্গে গাল-গল্পও করতেন। কিন্তু এমন সব অদ্ভুত কথা বলতেন যে ফের যখন হঠাৎ একদিন চিলে-কোঠায় মস্ত তালা ঝুলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, বাড়ির লোকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচত।

তবে বিলিতি খবরের কাগজে সত্যিই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। জীবজন্তু, গাছপালা, খাদ্য সমস্যা, এই সব বিষয়ে। বিদেশে তাঁর নাকি ভারি সুনাম ছিল। সেজন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সামরিক বিভাগ থেকে তাঁকে কি সব গোপনীয় কাজ দিয়েছিল। আর তিনি বাড়ি ফেরেন নি।

চিলে-কোঠার ঘরে সেই ইস্তক তালা পড়ে আছে। ভেতরে কি আছে কেউ জানত না। কাউকে ঢুকতে দিতেন না। বলতেন যে তিনি এমন সব গূহ্য অজানা বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন, সে সব যখন ইংল্যাণ্ডের বড় বড় কাগজে ফলাও করে বেরুবে, শুধু জীব-তত্ব নয়, গোটা অংকশাস্ত্র সম্বন্ধে দুনিয়ার বিজ্ঞদের সমস্ত ধারণা নস্যাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন কেউ নাক গলালে সর্বনাশ।

এই অবধি বলে শিবু জাপুর দিকে চেয়ে চোখ পিট পিট করতে লাগল। জাপু সামনে একটু ঝুঁকে বলল, 'তারপর?' 'তারপর আবার কি? সেজ-বুড়োঠাকুরদা আর বাড়ি ফেরেননি। ক্রমে বাড়ির এবং বাইরের লোক তাঁর বিষয়ে নানান্ অদ্ভুত গল্প বলতে শুরু করল। নাকি ঐ বন্ধ ঘর থেকে দাঁড়কাকের হেঁড়ে গলার হাসি শোনা যায়। সে-সব যে নারদের ডাক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মালিকের সঙ্গে সে-ও অদৃশ্য হয়ে গেছিল।

ঐ সব ঘটনা ঘটেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যিখানে। তখন ব্রিটিশদের রাজত্ব। তা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থামল। ব্রিটিশরা আর তাদের সপক্ষীয়রা জিতল। আরো পরে দেশ স্বাধীন হল। নতুন সরকার গঠন হল। কিন্তু চিলে-কোঠার দরজার তালা তেমনি ঝুলে

রইল। খালি একটু মরচে ধরে গেল। ছাদের ফাটল দিয়ে বর্ষাকালে ওর ওপর অল্প অল্প জল পড়ত।

তারপর ১২ বছরের বেশি কেটে গেল। বাকি বুড়োদাদুরা স্বর্গে গেলেন। সেজ-বুড়োদাদুও ১৫ বছর নিখোঁজ বলে, ধরে নেওয়া হল তিনিও নেই। শিবুর বাবা পুরনো নড়বড়ে পৈত্রিক বাড়িটা তখন অন্য শরিকদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে, আগাগোড়া মেরামত করার কাজে হাত দিলেন। শিবু সে সময় ১০ ক্লাসে বিজ্ঞান পড়ে। জাপুও তাই। ওদের সব চেয়ে উৎসাহের বিষয় হল বন-বিজ্ঞান।

বলা বাহুল্য, চিলে-কোঠা খালি করার কাজ শিবুকেই দেওয়া হল। জাপুকে ডেকে নিয়ে এক দিন দুপুরে শিবু ওদের ভাঁড়ার ঘরের ফেলে দেওয়া অকেজো চাবির গোছা থেকে সব চেয়ে বড়টাকে চিলে-কোঠার তালার ফুটোয় ঢুকিয়ে মোচড় দিল। চাবিটাও আটকে গেল। তখন ছাদে শুকোতে দেওয়া আমতেলের শিশি থেকে খানিকটা তেল নিয়ে রুমালে করে কয়েক ফোঁটা ছ্যাদায় ঢালতেই, খুব সহজে তালা খুলে গেল। তারপর তুলসীগাছের টব থেকে খানিকটা মাটি দিয়ে মেঝের তেলগুলো মুছে ফেলে, শিবু দরজায় একটু ঠেলা দিতেই, খুলে হাট।

অমনি নাকে এল ধুনোর গন্ধের সঙ্গে মেশা শুকনো ঘাসের খোসবো। ঐ হল ঘন বনের সুগন্ধ। মনটা আনচান করে উঠল। তক্‌তক্ করছে ঘরটা। যেন এক্ষুণি কেউ ঝাড়পোঁচ করে গেছে। তবু মধ্যিখানের কালো পাথরের টেবিলের ওপর দুগাছি কালো পালক চোখে পড়ল। দেয়ালের সারি সারি তাকে কাচের বোয়েমে গাছ-গাছড়া, শুকনো বিচি, স্পিরিটে ডোবানো বাদুড়, টিকটিকি, বিছে ইত্যাদি। আর ছিল টেবিলের ওপর মস্ত একটা বাঁধানো খাতা। তার মলাট খুলতেই প্রথম পাতায় লেখা ১৯৪২। এ পি সি ১৭। সেজ-বুড়ো-

দাদুর ডাইরি তাতে সন্দেহ নেই। ওঁর লেখা চিঠিও শিবু দেখেছে। ঐ রকম কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং হস্তাক্ষর। আশ্চর্যের বিষয় লেখাটা খুব পুরনো দেখাচ্ছিল না। শিবুর নিজের হাতের লেখার সঙ্গে খুব সাদৃশ্য।

সে যাই হক, সেজ-বুড়োদাদু খাতায় লিখেছেন ঃ—

'বিধাতার ন্যায়-বিধান দেখে বলিহারি। যত দিন নিজের প্রয়োজনমতো বে-আইনী কাজ করে এসেছি, ততদিন কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু এই আমার উনপঞ্চাশ বছর বয়সে, দস্তুরমতো সামরিক বিভাগের ছাড়পত্র নিয়ে, নিজের দেশের গভীর বনে পুষ্টিকর ছত্রাকের সন্ধানে নিজের দেহ পাত করে যেই ঘুরে বেড়াচ্ছি, অমনি যমদূতের মতো দুই মিলিটারি জল্লাদ আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, আমাকে বামাল পাকড়াও করে এই এ পি সি ১৭-র ফাটকে ঠুসে দিল। এ পি সি মানে এলিয়েন পার্সন্স ক্যাম্প। অর্থাৎ বিদেশী নাগরিকদের শিবির। কোনো ভাষা বোঝে না ব্যাটারা, না ইংরিজি, না হিন্দী, না বাংলা। ফরসা রং, কোন্ দেশী মালুম দিল না। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে টাকানি ছিল, নইলে তক্ষুণি আমার নাড়ি ছেড়ে যেত। ঐ আমার এক দোষ। বিপদ দেখলেই কুপোকাৎ!

টাকানির কথা বলা হয়নি। একবার বনে ঘুরে ঘুরে কোথায় যে কম্পাস্‌টা হারালাম, তা টেরও পেলাম না। ভুলভুলিয়াতে ধরল। অর্থাৎ এক-ই জায়গায় কেবলি পাক খেয়ে ঘুরে মরছিলাম। সেখান থেকে বেরুতে পারছিলাম না। প্রত্যেকবার পাহাড়ের গায়ে একটা কালো গুহার সামনে এসে পৌঁছচ্ছিলাম। তখন আমার এমন অবস্থা যে দাঁড়াতে পারছি না। শেষটা গুহার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েই গেলাম। হ্যাভারস্যাক্ থেকে সযত্নে রক্ষা করা শুকনো ছত্রাকগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের ধোঁয়া-ধোঁয়া গন্ধও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

হয়তো সেই গন্ধ পেয়েই গুহার ভিতর থেকে টাকানি বেরিয়ে এসে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, নিজের থলি থেকে বড় সুস্বাদু কিসের মাংস রোস্টের বড়ি খাইয়ে। কোন দেশের লোক তাও কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলত। পরম



বৈজ্ঞানিক। বলেছিল নাকি পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা খুব সহজেই দূর করা যায়। মঙ্গোলিয়ান চেহারা। আমার-ই মতো পোশাক পরা। সত্যি কথা বলতে কি, আমার-ও ঐ রকম খ্যাদাবোঁচা চেহারা। তাই শত্রুপক্ষ মনে করে, দিল দুজনকে ফাটকে পুরে। ফাটক বলতে অবিশ্যি কাঁটাতারের ঘেরা ক্যাম্প ছাড়া কিছু নয়। ইচ্ছা করলেই পালানো যেত।

কিন্তু টাকানি পালাতে রাজি হল না। নাকি আমরা পালালে

ওরাও তল্লাশি চালাবে। হয়তো গুহায় ঢুকে টাকানির গবেষণার জিনিস নষ্ট করবে। অবাক হয়ে বললাম, 'কি জিনিস?' টাকানি বলল, 'যা দিয়ে খাদ্য-সমস্যা দূর হবে।'

এর কিছু দিন পরে শত্রুরা বনটাকে ঘেরাও করল। সরবরাহের পথ বন্ধ হল। ক্যাম্পে খাদ্যাভাব দেখা দিল। না খেয়ে সব মরি আর কি! এমন সময় টাকানি গিয়ে কর্ণেল সাহেবকে বলল, 'আমার তৈরি বড়ি খেলে আর কোনো খাদ্য বা পানীয়ের দরকার হয় না। যুদ্ধ শেষে যদি আমাদের দুজনকে বিনা-সর্তে ছেড়ে দেন, তাহলে সেই বড়ি খাইয়ে সবাইকে বাঁচাতে পারি।' কর্ণেল তখনি কথা দিলেন। টাকানি ওর হ্যাভারস্যাক থেকে বাঁশের চোং ভরা ওষুধের বড়ি বের করে দিল। সবাই খেয়ে বাঁচল। আশ্চর্যের বিষয় হল তল্লাশীর সময় হ্যাভারস্যাকে বাঁশের চোং কেউ লক্ষ্য করেনি। সবাই বলল, ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। তা হক্ গে।

এখন সবাই জানে যে ঐ যুদ্ধে সায়েবরাই জিতেছিল। কর্ণেল আমাদের সত্যি সত্যি মুক্তি দিয়েছিলেন। আমিও সেই ইস্তক টাকানির ভক্ত শিষ্য হয়ে, আজ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে আছি এবং ইচ্ছামতো এই ঘরে আসা-যাওয়া করি। নারদ সঙ্গে থাকে। আমার বড় ইচ্ছা সময় হলে শিবুকে আমার সমস্ত অর্জিত বিদ্যা শিখিয়ে, চিরকালের মতো অন্য কোথাও চলে যাই। এদিকে বনটন সব কেটে ফেলছে। টাকানির আস্তানা আর নেই। কিন্তু তার বিদ্যেটা কাঁচা টসটস করছে। পৃথিবীর খাদ্যাভাব দূর করার আগে মন দিয়ে অংক শেখ্ বাছা। এবারে তোর পরীক্ষার পেপার দেখে টাকানি যা বলেছিল, তা মনে করলেও লজ্জায় আমার দু-কান লাল হয়ে যায়। ভালো করে অংক শেখ্। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র নির্ভরযোগ্য জিনিস-ই হল অংক। যে অংক আজ ঠিক, পাঁচ হাজার বছর পরেও সে ঠিক।

এখানেও যা ঠিক, চাঁদেও তা ঠিক। তবলার বোলের মতো। ঐ আমার আরেক শখ।

তোরা ভাবিস মাপের খালি তিন দিকে বিস্তার, লম্বা, চওড়া, বেধ। আসলে আরো তিনটে আছে :—ওজন, অবস্থান, সময়। অংকের সাহায্যে সে সমস্তই কব্জা করা যায়। তাই দিয়েই টাকানির সঙ্গে নারদসহ যেখানে যখন ইচ্ছে যাওয়া-আসা করি। আমাদের ফটো দিলাম। হেথা-হোথা গানের আসরে, ভিড়ের মধ্যে, দেখা পেতেও পারিস। রাতে এ-ঘরে আসিস্ না আর অংকের তালিম দে। ইতি আঃ সেজদা।

শিবু তারপর বলল, 'গত বছর পৌষ উৎসবের যাত্রার আসরে ঠিক ঐ ফটোর মতো দুজনকে দেখলাম। তবলা বাজাচ্ছিল। ভয় লাগল। তাই কাছে যাই নি।'

শিবু আজকাল অংক নিয়ে খুব খাটছে। বোধ হয় পাশ করে যাবে। একেকবার ভাবি ঐ চিঠিটা ওর বাবা লেখেনি তো?

ভয়

ছাপাখানাটি খুব ছোট হলেও সারাদিন সেখানে কাজ হত। ছুটি হতে হতে সেই সন্ধ্যে হয়ে যেত। ছাপাখানার পাশে একটা চায়ের দোকান ছিল। কুড়ি পয়সা দিলে এক ভাঁড় গুড়ের চা আর ঝাল-ঝাল আলু চচ্চড়ি দিয়ে মোটা হাতরুটি পাওয়া যেত। খেয়েই বঙ্কু রওনা দিত। দুটো বাড়ি, তারপরেই বন। এ-সব জায়গায় কোথায় শহর শেষ হয়ে বন শুরু হয় বলা মুশকিল। শহর বলতে অবিশ্যি খুবই ছোট শহর। গ্রাম-ও বলা চলে। তবে ছাপাখানায় অনেক বাইরের লোক কাজ করত। তারা ঐ গ্রামেই থাকত। গ্রাম বললে চটে যেত, বলত ছোট শহর।

বনের মধ্যে শালগাছই বেশি। মাঝে মাঝে পলাশ, মহুয়া, শিমুল, বুনো তাল। দিনের বেলায় চমৎকার। সন্ধ্যে হলেই মুশকিল। ছায়া-ছায়া; অদ্ভুত সব শব্দ। শিয্য-গুরু প্যাঁচা ডাকে। বনের নাম ঘনার বাদা। এককালে এখানেই কুখ্যাত ঘনা-ডাকাতের আস্তানা ছিল। সে প্রায় একশো বছর আগে। তখন কি দিনে কি রাতে, কেউ পারলে এ-বনের ধারে কাছে আসত না।

রাতে এখনো আসে না। দিনে মধু আর আধা নিতে এলেও, রাতে আসে না। ঘনা নাকি এখনো ডাকাতি ছাড়েনি। অনেকে নাকি দূর থেকে তাকে দেখে অমনি চোঁ-চাঁ দৌড় দিয়েছে।

বঙ্কুর নাইট-ইস্কুলটা বনের ওপারে। লেখা-পড়া শিখতে হলে কষ্ট করতে হয়। বাবার ডান পা কাটা গেছে, পেনশন পায়। তাতে ওদের চলে না। তাই বঙ্কুকে ওদের হাইস্কুল ছেড়ে এই নাইট-স্কুলে

পড়তে যেতে হয়। অন্য দিন সঙ্গে লখা থাকে। ওর বন্ধু লখাও ছাপাখানায় কাজ করে। দুজনে থাকলে ভয় করে না। ঘনা একা লোক খোঁজে।

তখনো আলো ছিল। হয়তো ছ-টা বেজেছিল। শালগাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ছিল। পাখি ডাকছিল। ঝোপে ঝাড়ে খুস্‌-খুস্‌-খর-খর। বঙ্কু আধ ঘণ্টার মধ্যে বন পার হয়ে বনবিভাগের আপিসের গায়ে লাগা নাইট-স্কুলে পৌঁছে গেল।

বছর বয়স চোদ্দ। আর তিন বছরে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস্‌ করে, ছাপাখানার কাজ-শেখার স্কুলে ভরতি হবে। পরীক্ষার জন্যেও তৈরি হবে; আবার রোজ পাঁচ ঘণ্টা কাজ করার জন্যে মাইনেও পাবে। আরো তিন বছর পরে পাস করে বেরুলে, সরকারি কাজ পেয়ে যাবে। মা-বাবা সেই আশাতেই আছেন। ছোট বোন নুটুও বলে, "দাদা আমাকে বড় পুতুল কিনে দেবে।"

তাই মন দিয়ে পড়ে বঙ্কু। পড়তে পড়তে ভাবে এরপর আবার বন পার হতে হবে। একা। এক সময় ছুটি হয়ে গেল। তখন রাত ন-টা। বঙ্কু আজ একা বনের পথ ধরল। সঙ্গে আলো ছিল না। আলো কোথায় পাবে, টর্চের বড্ড দাম। একটা বট গাছের কোটরে লখা কয়েকটা শুকনো বাঁশের আগা ছেঁচে শুকনো পাতা জড়িয়ে মশাল বানিয়ে, লুকিয়ে রেখেছিল। বঙ্কু সেই একটা বের করে, শহরের শেষ পান-বিড়ির দোকান থেকে ধরিয়ে নিল।

জগাদা বলল, "একা যাচ্ছিস নাকি? আজ আবার অমাবস্যা। লখা কোথায়?" "লখার জ্বর।" "না হয় আমার এখানে চাট্টি খেয়ে শুয়ে রইলি। সকালে বাড়ি যাস।" "মা-বাবা ভাববে, জগাদা।"

মশাল ধরিয়ে বঙ্কু রওনা হল।

মশালে যেমন আলোও হয়, তেমনি আবার মনে হয় চারিদিকে গাছের ছায়াগুলো নড়ছে চড়ছে। বঙ্কু পা চালিয়ে এগোতে লাগল।

হঠাৎ শুনল ছোট ছেলের কান্না। বঙ্কুর গায়ের রক্ত হিম। ও নিশ্চয়ই সত্যিকারের ছোট ছেলের কান্না নয়, অন্য কিছুতে ওকে ভোলাবার জন্যে ঐ রকম শব্দ করছে।

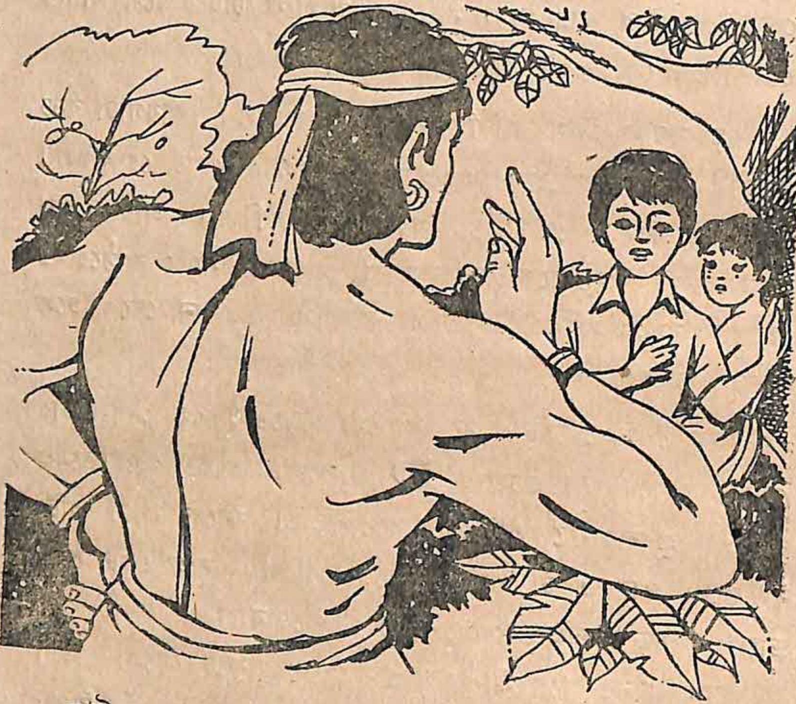
কোনো দিকে না তাকিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল বঙ্কু। ছোট ছেলেটার কান্না থামল না। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, আবার ফোঁপাতে থাকে। নুটু আগে ঐরকম করে কাঁদত।

বঙ্কু মশাল নিয়ে চারিদিকে খুঁজতে লাগল। জায়গাটা বড্ড ঘুপসি। তার মধ্যে বেদেরা খরগোশ ধরবার ফাঁদ পেতে রেখেছিল। কামড়ানো ফাঁদ। গোটা দুই খরগোশ পড়েছিল। আর একটা ছোট ছেলে। কাঠুরেদের ছেলের মতো দেখতে। সত্যি কাঠুরেদের ছেলে কি না কে জানে। এ জায়গা ভালো না। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু ছোট ছেলেটার মুখে আলো পড়তেই, বঙ্কু দেখল তার চোখের কোণে জল জমেছে, ঠোঁট কাঁপছে। হয়তো বছর তিনেক বয়স। বঙ্কু তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ফাঁদের কাটা কাটা দাঁতগুলো তার একটা পায়ে কামড়ে বসেছিল। সঙ্গে একটা সবুজ ডালেও কামড় পড়েছিল বলে পা-টা কেটে পড়ে যায়নি।

হঠাৎ কানের কাছে ফোঁস শব্দ শুনে দেখে কুচকুচে কালো একটা লোক; কপালে কাটার দাগ; লাল লাল চোখ; উঁচু উঁচু দাঁত; বিকট চেহারা। কিন্তু লোকটা নরম গলায় বলল, "টেনে খুলো না বাপু, পা কাটা যাবে, দাঁতের ফাঁকে ঐ পাথরটা গোঁজ।" মশালটা পাথরে ঠেকা দিয়ে, ছোট একটা অসমান ঢিল নিয়ে আস্তে আস্তে ফাঁদের দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিতেই ফাঁদের হাঁ বড় হল। বঙ্কু ছেলের ঠ্যাংটা টেনে বের করে আনল। ছেলেটা নেতিয়ে পড়ল। বঙ্কুর হাত-পা ঠাণ্ডা।

কালো বিকট লোকটা বলল, "না, না, কিচ্ছু হয়নি। ব্যথার চোটে অচৈতন্য হল। ঐ যে তোমার ডান হাতে ছোট ছোট পাতা দেখছ, ঐ খানিকটা পাথরে ঘষে লাগিয়ে দাও। দেখতে দেখতে ঘা সেরে যাবে।"



তাই করল বঙ্কু। লতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিল। তারপর ছেলেটাকে কোলে করে উঠতেই, লোকটা বলল, "আমার পা-টা কেউ বাঁচায়নি গো, আঙুলগুলো সব কাটা পড়েছিল।" ওর পায়ের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল বঙ্কু। ডান পায়ে একটাও আঙুল নেই।

এমন সময় দূরে মশালের আলো দেখা গেল আর ডাক শোনা গেল, নাকু-উ-উ-উ! হারে নাকু-রে-এ-এ! সঙ্গে সঙ্গে বিকট চেহারার লোকটা কোথায় যে সরে পড়ল, তার ঠিক নেই। ছেলেটাকে

খুঁজতে এসেছে গাঁয়ের লোকরা। সঙ্গে সঙ্গে তারা এসেও পড়ল। পাগলের মতো চেহারা ঐ বোধহয় ছেলের মা। বঙ্কুর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বারবার সে বলতে লাগল, 'বাঁচি থাক্, সুখী হ, ভগবান তোর ভালো করুক।'

নাকি কাঠুরেদের ছেলে। ভারি দুরন্ত। কেমন করে দল ছাড়া হয়ে গেছিল। তারপর হাসতে হাসতে সবাই দল বেঁধে গ্রামে ফিরল। ছেলের বাপ হঠাৎ বলল, "বড় বাঁচিয়েছিস্, বাপ্, ঘনার হাতে পড়লে উকে আর দেখতে পেতাম না। ঘনা বড় ভয়ঙ্কর।"

বঙ্কু বলল, "কেমন দেখতে ঘনা?"

"কি জানি! কাছে গেলি তো নিঘ্যাৎ মৃত্যু! শুনেছি কালো কুচকুচে, কপাল কাটা আর ডান পায়ে একটাও আঙুল নেই। বড় ভয়ঙ্কর সে।"

বঙ্কুর বুকটা ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। সে বলল, "না, না, ঘনা বড় ভালো, মোটেই বড় ভয়ঙ্কর নয়।" এর পর নাকি ঘনাকে আর কেউ কখনো দেখেনি।

হুঁদে দামুর জীবনখাতা

বটুর ছোটকাকা সর্বদা বলেন তাঁর বড়দার বন্ধু দামু জ্যাঠামশাই নাকি দুর্ধর্ষ পুলিসি গোয়েন্দা। তাঁর দাপটে তেত্রিশ বছর ধরে বর্ধমানে আর কেষ্টনগর এলাকায় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে। বাড়ির কাছে এ রকম একটা অসমসাহসিক পুরুষ বাস করাও নাকি মোটা জীবন-বীমার সমান। শুনে বটুর ছোট ভাই লাটু অবাক্! জীবন-বীমা করলে তো টাকা পায়। বটু বলল, 'অতই যদি সাহস হবে তো জ্যাঠামশাইদের তাসের আড্ডা ভাঙলে, উনি আমাকে কেন বলেন,—টর্চ নিয়ে আমাকে একটু গলিটা পার করিয়ে দে তো বাবা! সাহসী না আরো কিছু!'

ছোটকাকার মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল, 'যাকে তাকে পুলিসের বিশিষ্ট স্বুবর্ণ-পদক দেওয়া হয় না, বুঝলি!' বটু বলল, 'তা দেওয়া হবে না কেন? তুমিই তো বল ফি বছর সাহিত্যের পুরস্কারগুলো যাকে-তাকে দেওয়া হয়। বলনি তোমার কবিতার বই নাকি না পড়েই ডাস্টবিনে ফেলে দেয়?'

খুব চটে গেলেন ছোটকাকা। ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন; ঠিক তখুনি বড়জ্যাঠাদের তাসের আড্ডায় কে যেন ফটাশ্ করে এক হাত তাস টেবিলের ওপর ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'মার দিয়া কেল্লা। বাকি সব দান আমার!' থমথমে চুপচাপ। তারপর সোরগোল! তারপর সভা ভঙ্গ হল। এক গাল হাসতে হাসতে দামু জ্যাঠা বেরিয়ে এসেই বললেন, 'কোথায় গেলি বটু, আমাকে একটু গলিটা পার করে দে তো, বাপ।'

বটু বলল, 'আমার বুড়ো-আঙুলে ব্যথা। আমি পারব না। ছোটকাকা যাক।' ছোটকাকা ততক্ষণে হাওয়া।

লাটু বলল, 'পাঁচ মিনিটের তো হাঁটা। চলে যান না। আমি গেটের বাইরে দাঁড়াচ্ছি।' দামু জ্যাঠা ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'নিদেন ঐ তেঁতুলতলাটা পার করে দে, বাপ্। আর বাড়ি পৌঁছে দিলে, তোদের রাবড়ি আর সরভাজা খাওয়াব আর এমন একটা গল্প বলব যে চুলদাড়ি খাড়া হয়ে উঠবে!'

বটু লাফিয়ে উঠল, 'ঠিক তো? ওরে লাটু, শীগগির আয়, দামু জ্যাঠা গল্প বলবেন।' সঙ্গে সঙ্গে লাটুও খাড়া। তখন সবে আটটা, রাতের খাওয়া ন'টায়।

অদ্ভুত এক গল্প ফাঁদলেন দামু জ্যাঠা। দু-জনার হাতে দু-গেলাস ঘোলের সরবৎ ধরিয়ে দিয়ে যে ঘটনার কথা বললেন, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু যাঁর গলায় দু-রকম রঙের দুটো সুতোয় বাঁধা দু-রঙের দুটো মাদুলী আর ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে রূপোর চেন দিয়ে ঝোলানো কি-সব বিচিটিচির মতো দেখতে জিনিস, তিনি যে সহজে মিথ্যা কথা বলবার সাহস পাবেন না, এ বিষয়ে ওদের মনে কোনো সন্দেহ রইল না। অবিশ্যি তখন পর্যন্ত রাবড়ি আর সরভাজার দেখা নেই!

দামু জ্যাঠা গোড়ায় বললেন, 'কাছাকাছি এসে বোস। যদি নার্ভাস লাগে, বিষম খেতে পারিস।' সঙ্গে সঙ্গে লাটুর মুখের সরবৎ ভুল নল দিয়ে নেমে একাকার কাণ্ড বাধাল। যাই হক, ওর পিঠ চাপড়ে টাপড়ে চাঙ্গা করে, দামু জ্যাঠা শুরু করলেন,

"গোড়াতেই বলে রাখি এটা কিছু আমার বানানো গল্প নয়। বরং বলতে পারিস্ আমার জীবনখাতার দেড়টা পাতা। মাত্র দেড়টা পাতা! তার চেয়ে কত লম্বা লম্বা পাট মুখস্থ করে পুজোর সময়ে নাটক করে বাহবা পেয়েছি। কিন্তু এ গল্প মনে করতে গিয়েও কপাল

ঘামছে! জানিস বোধ হয় অসামাজিক সমাজে আমার নাম হুঁদে দামোদর। ও-নাম শুনলে, এদিকে এ হেন গুণ্ডা বা মাস্তান নেই যে শিউরে উঠে, জিব কেটে, কানের লতিতে চূণ না লাগায়।'

লাটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেন, চূণ লাগায় কেন?' বটু বিরক্ত হল, 'আঃ, তুই বড় বোকা। কানের লতিতে চূণ লাগালে যে পান খেয়ে মুখপোড়াদের জ্বলুনি সেরে যায়!' বটু বলল, 'অ। আচ্ছা, বলুন জ্যাঠামশাই, তাপ্পর কি হল।'

হুঁদে দামু বললেন, 'অত হাল্কা ভাবে ব্যাপারটাকে নিচ্ছিস দেখে অবাক হচ্ছি। এদিকে তো ভীতুর একশেষ। গল্প আরম্ভ হবার আগে থেকেই বিষম খাচ্ছিস! তা শোন্। সারা বছরের মধ্যে বর্ষাকালটা সবচেয়ে খারাপ তা জানিস তো?'

লাটু বলল, 'মোটেই না। ভূগোল স্যার বলেছেন বর্ষা না হলে ধানও হয় না। কাঁঠালের গায়ে জল না পড়লে কাঁঠালও মিষ্টি হয় না—'

দামু জ্যাঠা রেগে গেলেন, 'না শুনতে চাস তো বললেই হয়!' বটু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না, না, জ্যাঠামশাই, আমরা শুনতে চাই।'

'তাহলে আর ব্যাঘাত দিসনে। আমি অন্য অর্থে বলেছি বর্ষাকাল সবচেয়ে খারাপ। এখানে খারাপ মানে ভয়াবহ। জল পেয়ে প্রকৃতির বিকট দিকটা চাগিয়ে ওঠে। মানুষের কষ্টের শেষ থাকে না। বন্যা, ধ্বস, ভাঙ্গন, পথেঘাটে জল দাঁড়িয়ে যাতায়াতের অসুবিধা, ডাকাডাকি করলেও কেউ শুনতে পায় না।

পাড়াগাঁয়ে আর ছোট শহরে একেকটা বাড়ি যেন একেকটা দ্বীপ হয়ে যায়। তার চার দিকে উদ্দাম জলরাশি। ঢোকাও যেমন কষ্টকর, বেরুনোও তেমনি! এই সময় ঐ সব অঞ্চলে বেআইনী তৎপরতাও তাই বেজায় বেড়ে যায়। কেউ সাহায্য করতে আসবে না, আসতে পারবে না, জেনে দুষ্কৃতকারীরা নির্ভয়ে তাদের দুষ্কর্ম

করে যায়। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ হন্যে হয়ে আমার শরণাপন্ন হলেন "একটা যা হয় কিছু কর, ছুঁদে, নইলে শেষ পর্যন্ত সরকার হয় তো স্রেফ অকেজো বাজে খরচ বলে গোটা পুলিস-বিভাগকেই তুলে দেবেন। তখন তোমার চেয়ে আমাদের আরো বেশি ক্ষতি হবে—"এই অবধি শুনে আমার মনে ভারি একটা আত্মপ্রত্যয় জাগল। এঁরা তাহলে স্বীকার করছেন যে পুলিস-বিভাগে আমার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। তার পরে আরেকটু খুলে বললেন, "আমাদের ক্ষতি বেশি, কারণ আমরা বেশি মাইনে পাই। কিন্তু কাজের বেলা তোমার কাছে আমাদের ভূমিকা তুচ্ছ! এ যাত্রাটা বাঁচিয়ে দাও। তার জন্যে তোমাকে কখনো অনুতাপ করতে হবে না।"

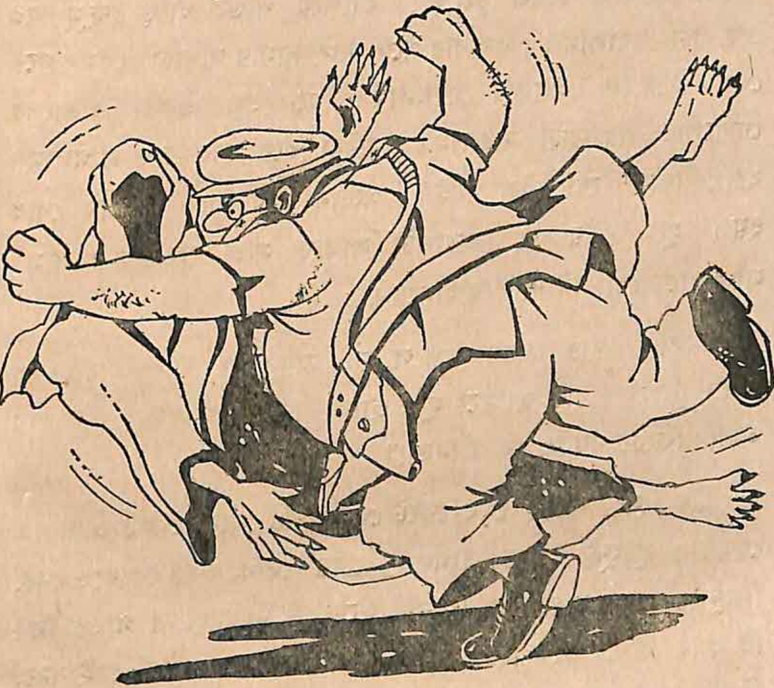
'আমিও মওকা বুঝে বললাম, "দেখুন আমার আর আট বছরের সার্ভিস বাকি আছে। এই গোটা সময়টা আমাকে যদি কেষ্টনগরে পোষ্টিং দেন, তাহলে একেবারে শেকড় থেকে পাপ উপড়ে ফেলার একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করতে পারি। তবে, স্যার, এই গন্ধমাদন তো চট করে তোলা যায় না। কিন্তু যতদূর বুঝছি এর কেন্দ্রবিন্দু হল গিয়ে ঐ কেষ্টনগর অঞ্চলটা। আমার বাপের ভিটে। ওখানকার বজ্জাতি আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।" মোট কথা সেই ইস্তক এখানে আছি। এবং বেশ সম্মানের সঙ্গেই কাজ করেছি। আমার পুরনো খেলার সাথীদের এক দল সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে, কি বোম্বাইতে, একজন কুয়েটে পর্যন্ত, হয় মামারবাড়ি, কিম্বা শ্বশুরবাড়ি, কিম্বা সংসারত্যাগী হয়ে চলে গেছে। বাকিদের দিয়ে আমি আমার নিজের একটা ছোট দল করেছি। তারাও নিয়মিত রোজগার পেয়ে বেঁচে গেছে, আমিও দরকারের সময়ে নাড়ি-নক্ষত্র জেনে আসার বন্ধু পাই। জানিস তো এর ফলে সোনার পদক-ও পেয়ে গেছি। এ দিককার অসামাজিক কার্যকলাপ অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। আসছে বছর অবসর নেব। শুনেছি মহা ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দেবে। পাখি-দেখার বাইনকুলার

উপহার দেবে। তোদেরো দেখতে দেব।

এত সবের বদলে ঐ একটাই যা ক্ষতি হয়েছে। সূর্য ডোবার পর কোনো গাছতলা দিয়ে যাতায়াত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তা তোরা যখন আছিস্, তখন একা যাবার দরকারটাই বা কি, তাই বল্। —ওগো, কোথায় গেলে? বটু লাটুর রাবড়ি আর সরভাজা দিয়ে গেলে না?" ভিতর থেকে জ্যাঠাইমার রাগত গলা শোনা গেল, 'কোত্থেকে দেব? তাস খেলতে যাবার আগে নিজেই তো সব সাবাড় করে গেলে!' দামুজ্যাঠা ভারি লজ্জা পেলেন। 'তাই তো! আমি ভাবছি বুঝি কিছু আছে। যাক গে, তার বদলে গল্পের সবচেয়ে লোমহর্ষণ জায়গাটা বলি শোন্। খুব সহজে এ জায়গাটাকে এতখানি পাপমুক্ত করা যায়নি। কপালের দুটো চক্ষু ছাড়াও কুড়িটা আঙুলের আগায় কুড়িটা চোখ নিয়ে চলাফেরা করত'ম। তাই ক্রমে বুঝলাম এখানে দুষ্কৃতকারী আর ভালো মানুষ আলাদা করা এত শক্ত, কারণ দুষ্কৃতকারীরাও ভালোমানুষ সেজে হেথা-হোথা চাকরি বাকরি, দোকান-ব্যবসা করে, দিব্যি একটা সততার মুখোস তৈরি করে, তার আড়ালে দুষ্কর্ম চালায়।

এর পর টপাটপ সব ধরা পড়তে লাগল। বিশেষ করে ঘোর বর্ষায় ওরা একটু অসাবধান হয়ে পড়ত। ভালো মানুষ সেজে ভদ্রলোকের বাড়িতে কোন অছিলায় ঢুকে পড়ে, যা কিছু ভালো জিনিস সব সরাত। পুরুষরা তখনো বাড়ি ফেরেনি। মেয়েরা চ্যাঁচালেও শোনা যেত না, গেলেও প্রায় অন্য কোনো বাড়ি থেকে সাহায্যকারীদের আসা-যাওয়া করার সাধ্য ছিল না! এই সময় ব্যাপারটা ঘটেছিল! শহরের শেষে মোড়ের মাথায় বড় বটগাছতলাটা ছাড়িয়েই খগেন সরকারের বাড়ি। সবাই জানত তেজারতি করে তিনি বেশ টাকা করেছেন। যদিও বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। বন্ধু লোক, তাই আমি নিজেও একটু চোখ রাখতাম। খগেনবাবু না ফেরা অবধি

বাড়িতে খালি কতকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে আর দু-তিনজন গিন্নি! সেদিন বটগাছের তলায় পৌঁছেছি এমন সময় আকাশ কালো করে ঝমঝম বৃষ্টি। দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম এখান থেকে নজর রাখলে সবচেয়ে ভালো হয়। হঠাৎ কানে এল খট্ খট্ খট্ করে কড়া নাড়ার শব্দ। ভিতর থেকে বৌদি ভয়ে ভয়ে বললেন, "কে?" বাইরে থেকে একটা লোক বলল, "মা, আমি! দঁরজাঁ খুঁলুন।" বৌদি বললেন, "কে আমি?" "আঁমি গোঁ মাঁ, আঁমি?" ভিতর থেকে বৌমাদের ভয়ার্ত চিৎকার, "খুলবেন না মা, নাকি সুরে কথা বলছে! ভূত ছাড়া কিছু হতে পারে না!"



বাইরের লোকটা কাতর ভাবে বলল, "না গোঁ মাঁ, আঁমি রাঁস-বিঁহারী! বাঁবুর ফিঁরতেঁ দেঁরি হবে, তাঁই এই মঁধু আর গাঁওয়া-

ঘি পাঁটিয়েছেঁন! দঁরজা খুঁলুঁন। জিঁনিঁস দিঁয়ে বাঁড়ি যাই।"

তবু বৌমারা বলে "ভূত! ভূত!" রাসবিহারী বলে, "নাঁ, বৌঁদিঁদি, ছোঁট বেঁলা থেঁকে আমি খোঁনা। দোঁকানের রাঁসবিহারী আমি। বাঁবু এঁলে শুঁধোবেন। মঁধু আর গাঁওয়া-ঘিঁ এঁনেছি, মাঁ।"

লোকটার বজ্জাতি দেখে আমি থ। ভূত সেজে গেরস্তর বাড়ি এসে, কয়েকটি মহিলা আর ছেলেপুলের ওপর হামলা করছে। শেষ পর্যন্ত মধু আর গাওয়া-ঘির জয় হল। হুড়কো খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমিও হতভাগাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সর্বাঙ্গ চটে জড়িয়ে এসেছে, ভিজে চুপ্পুড়! ঝাঁপিয়ে পড়েই ঘাড়ে দুম্দুম্ করে এক রদ্দা কষালাম। কষাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। মনে হল একটা বাতাসের দেয়ালের ওপর রদ্দা মারলাম। মরিয়া হয়ে হাতড়াতে লাগলাম। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কিছু নেই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম বোধ হয়। মুখে বৃষ্টির জলের ঝাপটা লাগতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম। লণ্ঠন হাতে বৌদিদি দাঁড়িয়ে হাসছেন,

"মস্করা করার জায়গা পেলে না, ঠাকুরপো? বড় বৌমা যে আরেকটু হলেই খুন্তি তাতিয়ে মুখে ছ্যাকা দিতে যাচ্ছিল! তোমার আবার ফিটের ব্যামো কে জানত!"

ঠিক সেই সময়ে মেঘ কেটে গেল, বিষ্টি থেমে গেল, চারদিকে জ্যোছনা ফুটফুট করতে লাগল। চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই, কিচ্ছু নেই! না রাসবিহারী, না ভিজে চট, না মধু, না গাওয়া-ঘি! কি বলব বাপ, একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। ঠিক সেই সময়, বিকট শব্দের সঙ্গে হুড়মুড় করে বুড়ো বটগাছটা মুখ থুবড়ে, পথ জুড়ে,

পড়ে গেল। সেই ইস্তক সূর্য ডোবার পর আমি গাছতলা দিয়ে একা কখনো যাই না।'

বটু বলল, 'অবসর নিলে ঢের সময় পাবেন। তখন আপনার জীবনখাতাটার সবটা লিখে ফেলবেন। সাহিত্য পুরস্কার কে ঠেকায় দেখব।'

বাতিঘর

শামুদের পহুদাহু নাকি এক সময়ে নদীপুলিসে চাকরি করতেন, অথচ সাঁতার জানেন না। এমন কি ওঁদের পুরনো বাড়ির বড় চৌবাচ্চায় একবার পড়ে গেছিলেন, অমনি টুপ করে ডুবে গেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শামুরা ওঁকে তুলে মুখে ফুঁ দিয়েছিল, তবে না ধড়ে প্রাণ ফিরে এসেছিল। নাকি নদীতে সাগরে যারা কাজ করে, তারা কেউ সাঁতরাতে জানে না। কিচ্ছু দরকার-ও হয় না। কি জানি। এদিকে বেজায় সাহসী। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এমন কোনো জ্যান্ত জানোয়ার নেই যাকে উনি ভয় পান। তবে কি না ইয়ে—।

পহুদাহু বলেন কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হুগলী নদীর দুই তীর আর নদীমুখের প্রতিটি আগাছা আর ঘাসের চাপড়া ওঁর চেনা ছিল। জলের তলাকার প্রতিটি গর্ত আর বালির চড়া ওর মুখস্থ ছিল। গত তিনশো বছরের মধ্যে কবে কোথায় কোন জাহাজ, নৌকো বা ভেলা ডুবেছিল এবং সেই ডোবাতে কার কি ধরনের আর কতখানি লাভ বা ক্ষতি হয়েছিল, সব তাঁর নখদর্পণে ছিল। দুই তীরের প্রতিটি গাছ ওঁর পুরনো বন্ধু ছিল। কার ডালপালা বাঁকা বা ভাঙা কেন, তাও তাঁর অজানা ছিল না। প্রত্যেকটি ভাঙা দেওয়াল, ধ্বসে যাওয়া দুর্গ, গাছ-গজানো ইঁটের গাদা, মজা পুকুর, শুকনো কুয়ো, খোড়ো ঘর, টালির গুদোম, এমন কি সমস্ত নালার মুখ,

কার, কবেকার এবং কিজন্য তৈরি তার ইতিবৃত্ত তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারতেন। এখন অবিশ্যি পতুদাতুর ৯১ বছর বয়স, তাই কিছু কিছু ভুলে গেছেন। শামুদের তাঁর ঐ সব লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতার কথা বলতেন শুধু একটা শর্তে। কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পাবে না। বুঝতে না পারলেও, না। তাতেও সবাই রাজি ছিল।

কালীঘাটে খালের পারে শামুদের বাড়িতে প্রায় প্রত্যেক রবিবার সকালে নৌকো চেপে আসতেন। সঙ্গে আনতেন গামছায় বাঁধা এককেটা প্রায় কিলোটাক ওজনের তুতিনটে চাঁদামাছ, কি কাছিম, কি বিশাল দাঁড়া কাঁকড়া, নিদেন খান কুড়ি কচ্ছপের ডিম। সারা দিন গালগল্প, খাওয়াদাওয়া, তুপুরে ঘুম, বিকেলে চা সেরে, হঠাৎ বলতেন, 'ঐ যাঃ! শেষটা না ভাঁটা পড়ে যায়।' বলে সঙ্গে সঙ্গে নৌকো চেপে রওনা দিতেন। ভাঁটার আগেই পৌছতে হবে। অন্ধকারে জলে থাকা নয়। জলে জাতু আছে।

সেবার এ-কথা শুনে শামুরা মুখ লুকিয়ে হেসেছিল। পতুদাতুর কি রাগ, 'জলের কথা তোরা কি জানিস রে, ছোঁড়া? জর্জ-মেরি বালিচরের নাম শুনেছিস্? ওপর থেকে মালুম দেয় না। আগে এত জাহাজডুবি হত যে তাদের মাস্তুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো উঁচিয়ে থাকত। সে সব দিন গেছে বটে, কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে তারা জলের ওপর ভেসে ওঠে। অনেক লোক দেখেছে। নদী পুলিশের কাজ খুব সোজা নয়। কোন বিপদটা সত্যি আর কোনটা বা স্বপ্ন তাই বা কে বলে দেবে? হ্যাঁ!' এই বলে হাঁড়িমুখ করে নৌকোয় চেপেছিলেন।

আসলে নাকি সত্যিকার আত্মীয় নন্। ফ্রেজারগঞ্জের কাছে শামুর ঠাকুমার মামাবাড়ি সম্পর্কে কি রকম দাদা। বোধ হয় পাড়াতুতো। তবে সেটা কিছু বড় কথা নয়। নিজের দাদারা তো

খোঁজ খবর নেয়ই না, এমন কি মরেও গেছে। তাই পত্নুদাত্নুর এ-বাড়িতে এত আদর। আর শুধু শামু কেন, শামুর বন্ধুরাও ওঁকে ভারি পছন্দ করে।

তা এবার পুজোর সময় দেয়ালীর পর দিন সকালে ছোট নাতি গোবরাকে সঙ্গে নিয়ে বেশ সকাল সকাল পত্নুদাত্নু এসে হাজির হলেন। তুজনের হাতে ত্নটো গামছায় বাঁধা কুড়িটা-কুড়িটা চল্লিশটা প্রকাণ্ড গলদা চিংড়ি! দেখেই সকলের চক্ষু চড়কগাছ! পত্নুদাত্নু বললেন, 'মা-কালীকে দেখিয়ে তবে রান্না। তিনি একবার এই দিনে আমার বড় উব্‌গার করেছিলেন। হঠাৎ সে কথা মনে পড়ে গেল। ত্থাখ রে গোবরা, চারটে নারকেলও হবে।' বাড়ি ভর্তি লোকের খাওয়া-দাওয়া হলে পর, মাঝের ঘরের ফরাসে শুয়ে টেনে ঘুম। বিকেলে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে শামুর বড় জ্যাঠামশাই বললেন, 'এত বড় আর এত মিষ্টি গল্‌দা শুধু আজকাল কেন, কোনো কালেই এ অঞ্চলে দেখা যায় নি। কোথায় পেলেন মামা?'

পত্নুদাত্নু তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে, শিরদাঁড়া সোজা করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বললেন, 'এই হুগলী নদীর একটা বিশেষ জায়গায় রাতে দড়ি বেঁধে হাঁড়া ডুবিয়ে রাখা হয়, তুদিন বাদে ভোরে সেগুলো টেনে তোলা হয়। কপাল ভালো হলে না অনেক লোক এক এক হাঁড়ায় হাত লাগায়। অন্য কোথাও, অন্য কোনো ভাবে আমাদের লোক ছাড়া আর কারো হাতে এ জিনিস উঠবে না। আর বছরে ঐ একবারই উঠবে।'

তারপর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে ইদিক-উদিক চেয়ে বললেন, 'সে কি আজকের কথা? হয়তো ৪১ কি ৪২ সাল হবে, ভালো করে মনেও করতে পারি না। তখনি আমার বয়স ৫০-এর ওপরে। পাকা-

পোক্ত, সবচেয়ে অভিজ্ঞ আর বিশ্বাসী নদী পুলিশের একজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা হঠাৎ বড্ড কাছে এসে পড়েছিল। আরো পরে ডিসেম্বর মাসে এখানে ওখানে, কলকাতায় আর তার আশেপাশে জাপানীরা বোমা ফেলেছিল, কিছু লোকও মরেছিল। শহর ছেড়ে অনেকে পালিয়েছিল। বোমার সময়ে তারা ফিরেও এসেছিল। সন্ধ্যে থেকে চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালীপুজোর দিনও কোথাও একটা আলোর রশ্মি দেখাবার উপায় নেই। পরদা টেনে, ঘেরাটোপ দিয়ে, দরজা-জানালা বন্ধ করে সেবার সব পুজো হল। যেন কতই না লজ্জার ব্যাপার। একটা পাঁঠা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সব মিলিংটারিতে কিনে নিয়েছিল। তার ওপর আমি বাড়ির বড় ছেলে, এক দিনের জন্যেও ছুটি চাইতে পর্যন্ত পারলাম না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে, নিঃশব্দে, লঞ্চে করে রোজ রাতে চাঁদপাল ঘাট থেকে স্রোতের সঙ্গে ১০ মাইল টহল দিচ্ছি। অন্ধকারে যথাস্থানে বোমা ফেলার যেমন অসুবিধা হয়, তেমনি আবার প্যারাশুটে করে কমাণ্ডো নামাবার সুবিধাও হয়। বোমা অবিশ্যি ডিসেম্বরে ওরা খোলাখুলি দিনের বেলাতেই ফেলেছিল। সে যাই হক। আমাদের কাজ হল যাতে কোনো নির্জন জায়গায় প্যারাশুটে নেমে নৌকো করে নদী পথে এসে ফোর্ট উইলিয়ামের কেউ না ক্ষতি করে, সেইটে দেখা। ঠাকুমা বলতেন সে রাতে স্বয়ং মা-কালী নাকি ভিড়ের সঙ্গে মিশে আলোর শোভা দেখতে বেরোন।

তবে ১৯৪২ সালের ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকারে কি দেখতে বেরোবেন? এক যদি জাপানী বোমারু ঠেকাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে। নিঃশব্দ মটর লাগানো সরু লঞ্চে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছি। মনে হচ্ছে নৌকোর তলাটা জলের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে যাচ্ছে, ভাবছি এমন তেল-তেলা নদী ভূ-ভারতে আর নেই। আবার ভাবছি

ঐ তেল-তেলা জল থেকে অন্ধকারেও কেমন একটা আভা বেরোচ্ছে, তাতে আমরাও যেমন জলের ওপরটা দেখতে পাচ্ছি, তেমনি আকাশ থেকে আমাদের লঞ্চটাও মালুম দিচ্ছে না তো? তা ছাড়া আরেকটা ভয়ও ছিল। এই জগৎজোড়া আতঙ্কের মধ্যিখানেও কলকাতার দুষ্কৃতকারীরা যে-যার সুবিধা করে নেবার তালে আছে, এর আগেও তার প্রমাণ পেয়েছি। ভয়-ডর নেই তাদের। ঠাকুর-দেবতাকেও বিশ্বাস নেই। চাই-কি কালীপুজোর এই নিকষ কালো অন্ধকারে চুপিসাড়ে গিয়ে সেই গোপন জায়গা থেকে ডুবোনো হাঁড়া তুলে গলদা পাচার করলেই বা দেখছে কে? যে-রকম ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায় ওরা, লুকনো জায়গাটা জেনে ফেলাও অসম্ভব নয়।

আকাশে এদিকে একটা অসময়ের ঝড় পাকিয়ে উঠেছে। কালির শিশিতে আরো কালি ঢাললে যা হয়, তাই হচ্ছে। জলেতে আকাশেতে তফাৎটা ক্রমে দূর হয়ে যাচ্ছে। চারদিক থমথম করছে। কোথায় নদীর তলায় গর্ত, কোথায় বালির চড়া—আমি যে আমি, আমারি তা গুলিয়ে যাচ্ছে, অন্য লোকের কা কথা! এমনি রাতেই হয়তো—ও কি?

বুকটা ধড়াশ করে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সরু পান্‌শির মতো একটা নৌকো অন্ধকার ভেদ করে শাঁই করে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল। কি করে দেখলাম জিগ্‌গেস করিস্ না। বিপদের সময় মানুষের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় গজায়, হয়তো তারি সাহায্যে। সঙ্গে সঙ্গে হড়-হড় করে মোটা শেকলের মতো কিছুতে বাধা পেয়ে আমাদের লঞ্চ প্রায় উল্টোয় আর কি! আমাদের চক্ষু স্থির! 'হোয়াট? হোয়াট' করতে করতে আমাদের অপিসার ক্যাপ্টেন গ্যারিক ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ সে দূরবীণ দিয়ে আকাশ দেখছিল।

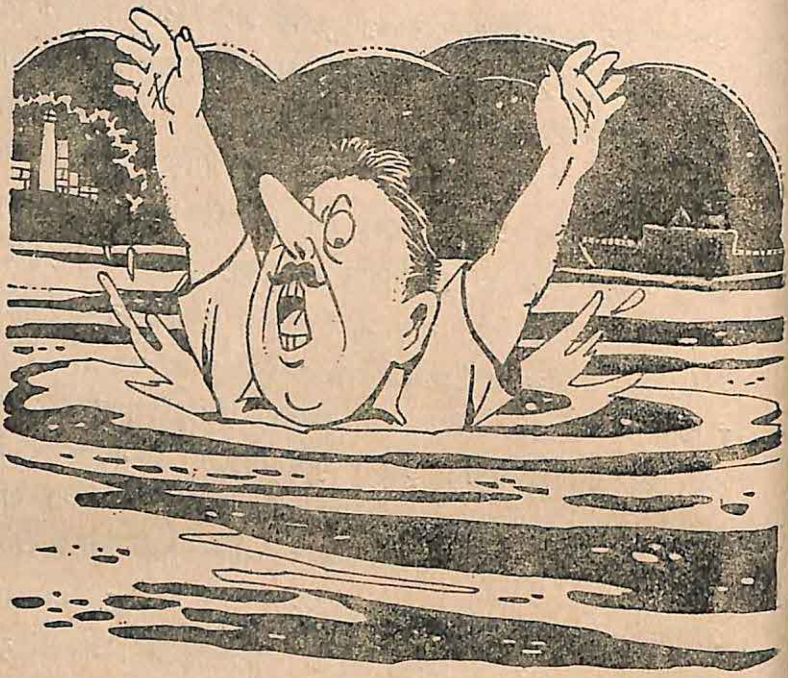
অন্ধকারেও জায়গাটা চিনতে পারলাম। গায়ের রক্ত হিম হয়ে

গেল। আসন্ন ঝড়ের অন্ধকারে সব লেপে-পুঁছে একাকার হয়ে গেলেও, মানসনেত্রে দেখতে পাচ্ছিলাম বাঁয়ে সেই অষ্টাবক্র তেঁতুল গাছ, যার নিচে কোনো মাঝি মরে গেলেও নৌকো বাঁধে না। তার ওপরে ওলন্দাজদের ওয়াচ্-টাওয়ারের ভগ্ন-স্তূপের ইঁটের গাদা। আরেকটু ওপরে পুরনো পর্তুগিজ বাতিঘর, তার ফোক্‌লা দাঁত আর কানা চোখ নিয়ে অমাবস্যার অন্ধকার আর ব্ল্যাক-আউটের কালো কম্বল আর আসন্ন ঝড়ের কালিমা গায়ে জড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সরু পান্‌শি চেপে শত্রুদের চর কোথায় গিয়ে সেঁদোল কার বাবার সাধ্যি বোঝে। মাছ ফাছ তুলে নিলেই বা কে বাধা দিচ্ছে!

সায়েবকে কিছু বলা যায় না। অমনি হুকুম দেবে পাছু নাও! রকেট উড়িয়ে, ফ্লেয়ার জ্বেলে, রাতকে দিন করে, সাংঘাতিক এক মিলিংটারি তল্লাশি চালাবে। চিরকালের মতো আমাদের গাঁয়ের লোকদের গলদার হাঁড়ি ডুবনো ঘুচে যাবে। জানিস বোধ হয় মিলিংটারি সায়েবদের হাত থেকে জাপানী কমাণ্ডো যদি বা বাঁচে গল্‌দা চিংড়ি কদাচ নয়। বলতে এতটা সময় লাগল, কিন্তু ঘটতে লেগেছিল হয়তো আধ মিনিট। তারি মধ্যে লঞ্চ কাৎ হয়ে যাওয়াতে সায়েব, আমি, বিলিতী গানাররা দু-জন আর চার দিশী সারেঙ্গ ঝুপ ঝুপ করে জলে পড়ে গেলাম। বলেছি তো যারা জলে জলে জীবন কাটায় তারা কেউ সাঁতার শেখে না। কারণ জলকে তারা ভয় পায় না। যারা ডাঙায় থাকে, কিন্তু মাঝেমধ্যে জলে নামে আর মাঝিরা সবাই দক্ষ সাঁতারু হয়।

তা আমরা কজনা টুপ করে ঐ তেল-তেলা জলে ডুবে গেলাম। একবারে কেউ ডোবে না জানিস্ তো? থেকে থেকে ভেসে ওঠে, বাঁচবার চান্স পায়। আমরাও বারকয়েক ডুবলাম, আবার ভাসলাম। সায়েবগুলোর কথা আর বলিস্ নে। তারি মধ্যে খচমচ করে কাৎ

হয়ে যাওয়া লঞ্চে চেপে বসল। সারেঙ্গরা মাঝির ছেলে, তারা সাঁতরে অপর পারে ডাঙায় উঠল।



আর আমি? আমার কথা বলিস্‌নে! প্রাণপণে ঠ্যাং হাত ছুঁড়ে কতবার যে ডুবলাম আর ভাসলাম তার ঠিক নেই। শেষটা দেখি দিব্যি ভেসে আছি! এমন কি ডাঙার কাছেও পৌঁছে গেছি। আর সবচেয়ে অদ্ভুত, চারদিক আলোয় আলো! পর্তুগিজ বাতিঘরে কে এ আর পি-কে তুচ্ছ করে, বিরাট মস্ত বাতি জ্বেলেছে! আর সে কি হট্টগোল! দেখি কানে মাকড়ি, মাথায় ফাট্টা, হাতে মুগুর নেংটি পরা এক দল লোক গোটা পাঁচেক ছিপ আর জনাদশেক বেঁটে লোককে কোণঠাসা করেছে। দেখেই ভাবলাম তবে আমি নিশ্চয় মরে গেছি,

স্বর্গে গেছি, মা-কালী তাহলে আমার সব দুষ্কর্মের কথা জানতেই পারেন নি—যেমনি ভাবা, অমনি মুচ্ছো !

যখন জ্ঞান হল, নাকে এল গলদা-চিংড়ির খোশবাই ! চেয়ে দেখি রাত ভোর হয়ে গেছে। আমি আমাদের গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছি। আমার পাশে গল্‌দা চিংড়ির গাদা, প্রতি বছর যেমন হয়। ধড়মড় করে উঠে বসতেই, গাঁয়ের লোকরা আনন্দ কোলাহল করে উঠল, 'মরেনি ! মরেনি ! চিংড়ি খেতে বাধা নেই !' শুনে আর একবার মুচ্ছো না গেলেও খুব হেঁচকি উঠল। তবে দুপুরে নারকেল চিংড়ি খেতে কোনো অসুবিধে হয়নি ! এই বলে পচুদাদু গল্প থামিয়ে উঠে পড়ার উদ্যোগ করছেন দেখে, শামুরা ৭/৮ জন ওঁর কাছা ধরে ঝুলে পড়াতে, উনি থপ্‌ করে বড় তাকিয়াটার ওপর বসে পড়ে, শামুর মার হাত থেকে আরেক পেয়ালা চা নিয়ে বললেন,

'হ্যাঁ, ঐ যে বলছিলাম সায়েবগুলোর কথা আর বলিস্‌নে। পরে কাগজে পড়লাম ওরা যেই দেখেছে বাতিঘরে জোর বাতি জ্বলছে , অমনি ভয়ডর ভুলে, লঞ্চ থেকে ছোট নৌকো দুটো নামিয়ে ডাঙায় চলে এসেছে। কার এত আস্পদ্দা যে ব্ল্যাক্‌-আউট ভাঙে ! আর কারফিউ বলবৎ থাকতে কারা এত হল্লা করছে ! সঙ্গে সঙ্গে দপ্‌ করে আলো নিবল। সব চুপ। এসে দেখে গোটা দশ বারো জাপানী কমাণ্ডো তাদের ছিপের ওপর এলোপাতাড়ি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ছিপ টেনে কাদায় তোলা। কানা বাতিঘরে একশো বছর বাতি জ্বলেনি। জনমানুষের সাড়া শব্দ নেই ! গ্যারিক আর গানারদের জয় জয়কার, টাকাকড়ি মেটেল ফেটেল পেল। ওন্‌লি স্যাড্‌ থিং হল প্যাডুই নিশ্চয় একলা লড়ে ওদের ঘায়েল করে, নিজে জলের তলায় তলিয়ে গেছে ! প্যাডুর জন্য টুপি খুলে

খানিকক্ষণ দাঁড়াল-টাঁড়াল। ওদের মাইনেও বাড়ল।'

'আর তুমি? চাকরিতে ফিরে গেলে না?' 'পাগল, আর যাই কখনো? শেষটা যদি সত্যি করে মরেটরে যাই! সায়েবরা আমাকে লস্ট ইন অ্যাক্‌শন রিপোর্ট দিয়েছিল। চেতলার বাড়িতে টাকাকড়ি পাঠিয়েছিল। 'তা গাঁয়ের লোকরা খুব সাহসী বলতে হবে। ঐ অন্ধকারে চিংড়ি তুলল, জাপানী ধরল, তোমাকে প্রাণে বাঁচাল! খুব বীর পুরুষ!' 'আরে দূর! দূর! তাই করে কখনো! তাহলে তো ঐ কুখ্যাত অষ্টাবক্র তেঁতুলতলা দিয়ে আসতে হবে। তোরাও যেমন! অর্ধেক ছিল তক্তাপোষের তলায়, বাকি অর্ধেক আলো জ্বলা দেখে আর হট্টগোল শুনে মুচ্ছো গেছিল। তাপ্পর ভোরে উঠে চণ্ডীমণ্ডপে চিংড়িসহ আমাকে দেখে সকলের ফূর্তি! ওদের বিশ্বাস আমি একলাই সব চিংড়ি তুলে এনেছিলাম। ডবল ভাগ নিয়ে সেদিন চেতলা ফিরেছিলাম। আর কখনো নদী পুলিশের ধার কাছে যাই নি; বাবা, পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচা নিয়ে কথা।'

শামুর ঠাকুমা বললেন, 'কিন্তু পচুদা, তা হলে কানে মাকড়ি, নেংটি পরা ঐ লোকগুলোই বা কে?'

পচুদাহু উঠেই পড়লেন, 'কে জানে কে! তবে একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মা-কালীর চিংড়ি ফাঁকি দিতে পারে না কেউ। তিনি নিজেই ব্যবস্থা করে নেন। চল রে গোবরা। আর ছাখ্, এ-সব কথার এক বর্ণ যদি তোর ঠামুর কানে তুলিস্ তো আর কখনো কোথাও নিয়ে যাব না।'

গোবরা বলল, 'আমি শুনতে পাইনি দাছু, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

শুধু গল্প নয়

নাম হল 'শুধু গল্প নয়', কারণ বইতে প্রবন্ধও আছে। যদি বল গল্পে আর প্রবন্ধে তফাৎ কি, তাহলেই মুশকিল। অনেকের মতে গল্প মনের মধ্যে আপনি ফুটে ওঠে আর প্রবন্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি, তথ্য, চিন্তা—এই পথ দিয়ে বানাতে হয়। কিন্তু তাই কি? ভ্রমণ কাহিনী বা স্মৃতিকথা তো একাধারে প্রবন্ধও আবার গল্পও। তাছাড়া ঐতিহাসিক গল্প, বিজ্ঞান নির্ভর গল্প, যত না আপনি ফুটে ওঠে, তার চেয়ে বেশি নির্ভুল তথ্যের সাহায্য নেয়।

কেউ কেউ বলেন তফাৎটা মাল-মশলায় নয়। আসলে গল্পের প্রধান উপজীব্যই রস আর কাল্পনিকতা। প্রবন্ধর কাজ জ্ঞান দেওয়া, বাস্তব সত্য পরিবেশন করা। ওতে মনগড়া কথা যত কম থাকে ততই ভালো। প্রবন্ধ হল তথ্যের ব্যাপার; রসটস বাদ দেওয়াই উচিত। অবিশ্যি তাহলে কেউ প্রবন্ধ পড়বে না, এক ক্লাসে ছাড়া।

আমাদের মনে হয় তফাৎটা অন্য জায়গায়। উপকরণেও নয়, রসেও নয়। কত লেখককে তথ্যমূলক রচনা গল্পের আকারে পরিবেশন করতে দেখেছি। তফাৎ হল উপস্থাপনায়। গল্প হয় ঘটনামূলক এবং তাতে বানানো চরিত্রও থাকে। বাস্তব সত্যের সঙ্গে, ঐ ঘটনার সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। চরিত্রগুলোকে বাস্তব জগতে দেখা না-ও যেতে পারে। গল্পের ক্ষেত্রই আলাদা। সেখানে কোনো নিয়মকানুনও চলে না।

আর প্রবন্ধ? তাতে বানানো চরিত্র ঢোকালেই সে প্রবন্ধত্ব হারাবে। কিন্তু প্রবন্ধ নীরসও হবে না আর বাস্তব জগতের বাইরেও যত দূর চিন্তার প্রসার তত দূর তারও বিস্তার। গল্প প্রবন্ধ পরস্পর-বিরোধীও তো নয়ই, বরং বলা যায় সব গল্পের মূলে একটা অশরীরী প্রবন্ধ থাকে আর তেমন হলে সব প্রবন্ধ দিয়েই নতুন নতুন গল্পের ভিত্তিও করা যায়। তবে আমার নবীন পাঠকরা তা না করলেই ভালো।

—লীলা মজুমদার

আজকাল

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কোন ঘরে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, বাড়ির কেউ ঠিক করে বলতে পারল না। সবচেয়ে পুরনো বাড়িটাকে বলা হয় মহর্ষি ভবন, যদিও সেটা আরো অনেক আগে তৈরি হয়েছিল। তার সামনের দিকের বড় বড় ঘরের দু-পাশেই চওড়া বারান্দা, চওড়া সিঁড়ি, পুজোর দালানের সামনে থেকে উঠে গেছে। মনে হয় এ দিকটা পরে তৈরি। দালানের পিছনে অন্দর মহলের ঘরগুলো ছোট ছোট, আলো-হাওয়া কম, উঁচু ধাপের সরু সরু সিঁড়ি। কয়েকটা ছোট ছোট উঠোন-ও আছে, সরু রক্‌ লাগানো। একজন আমাকে একটা উঠোনের সামনে সমান ঘুপসি দুটি ঘর দেখিয়ে বললেন, 'এর একটাতে গুরুদেব জন্মেছিলেন। তবে কোনটা তা কেউ বলতে পারছে না।' অবাক্‌ হয়ে গেলাম। জন্মাবার ১২৪ বছর পরেও যাঁকে মনে করে হাজার হাজার দেশবাসী জোড়া-সাঁকোয় ঐ বিশেষ দিনটিতে জড়ো হচ্ছে, তিনি কোন ঘরে প্রথম চোখ খুলেছিলেন কেউ জানে না!

কিন্তু জন্মাবার ৮০ বছর পরে যেদিন তিনি চোখ বুজলেন, সেই সময় আমি তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। দোতলার যে বড় ঘরে তোমরা গিয়ে ফুল দাও, সেখানে সেদিন সকালবেলায় দেখলাম নিচু একটি সরু খাটে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। ঘরের দরজা

প্রায় সব বন্ধ। কি শান্ত, স্নিগ্ধ, অপরূপ মুখখানি। কষ্ট বা বেদনার কোনো চিহ্ন নেই। সোজা হয়ে শুয়ে আছেন, হাতির দাঁতে খোদাই করা নিখুঁৎ এক দেবমূর্তি। মৃত্যু যে এত মধুর হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। বুকখানি আস্তে আস্তে উঠছে পড়ছে। ডাক্তার অক্সিজেন দিচ্ছেন। মুখের দিকে চেয়েছিলাম, এর মধ্যে এক সময় বুকের ওঠা-পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার অক্সিজেনের নল নামিয়ে রেখে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। আমি দু'চোখ ভরে দেখে নিয়ে ঘর থেকে চলে এলাম। সব দরজা খুলে দেওয়া হল। দুদিকের বারান্দা শোকাচ্ছন্ন দর্শকে ভরে গেল। সেদিনের কথাও দেশবাসীরা বছরে বছরে মনে করে।

যে-কথা বলতে চেয়েছিলেন সে-সব লিখে রেখে গিয়েছেন। মানুষের মনের সব সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে ২০০০ গান রচনা করেছেন। সে-সবই রয়েছে। নেই শুধু রবীন্দ্রনাথ বলে মানুষটি। তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল, তাদেরো বেশির ভাগ বিদায় নিয়েছে। বইতে যে-সব লেখা যায় না, সে সব ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। অন্যায়কারীকে সামনে ধরে এনে দিলে, তার দিকে এমনি মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকাতেন যে সে তক্ষুণি ভেঙে পড়ত। এ-কথা কজন জানে?

একবার আমার বিষয়ে কয়েকজন মিথ্যাবাদী নিন্দুক কয়েকটা কথা তাঁকে বলেছিল। এ-কথা শুনেই রেগেমেগে ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। আমার তখন ২৩ বছর বয়স। উনি বললেন, 'হ্যাঁ, বলেছে তো কি হয়েছে? তোমার গায়ে ফোস্কা পড়েছে কি?' সব রাগ গলে জল হয়ে গেল। বললেন, 'বস। বলুক না যা খুশি তাই। আমার বিষয়ও তো কত কিছু বলেছে, এখনো বলে। লোকের কথা শুনতে গেলে কোনো কাজ করা যায় না।'

আরেক দিন বিকেলে গাড়ি করে সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। পাকা ধানের খেতের পাশে গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'নামো। কান পেতে শোন ধানের গান।' কান পেতে শুনলাম বাতাসে পাকা ধানের শীষ দোল খাচ্ছে আর পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুম ঝুম করে কি মিষ্টি শব্দ উঠছে। আগে কখনো লক্ষ্য করিনি।

'এই দেশেতে জন্ম'

সব গল্পসল্পই মজার ব্যাপার হয় না। মজার ব্যাপার না হয়ে, বরং যা দুঃখের ব্যাপার, তার মধ্যে থেকেও যদি তোমরা কিছু মঙ্গল লাভ করতে পার, তবেই তোমরা সুখী। তোমাদের হাতে আমাদের দুঃখী দেশটার মঙ্গল হবে। ঐখানেই তোমাদেরো মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়ে যাবে।

বুধবার, ৩১-এ অক্টোবর, ১৯৮৪, ভারতের কপালে আরেকটা কলঙ্ক পড়ল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের দুজন রক্ষী তাঁকে গুলি করে হত্যা করল। এ-কথা তোমরা সকলেই জান। কাজটা এতই জঘন্য যে সারা পৃথিবী শিউরে উঠেছে। শত্রুর হাতে মরা এক কথা, বিশ্বাসী অনুচরের হাতে মরা তার চেয়ে সহস্র গুণে হতাশার কারণ। তিনি একলাই মরেন নি, আমরা সকলেও খানিকটা করে মরে গেছি। এর ক্ষতি তোমাদেরো পূরণ করতে হবে।

তোমরা এ-কথাও জান ৩১-এ অক্টোবরের ঐ অভাবনীয় ঘটনার ফলে দেশ জুড়ে একটা প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এবং অনেক জায়গায় সেই প্রতিবাদ হিংসার আকার নিয়েছে। অনেক নির্দোষ নাগরিকও তার বলি হয়েছে। যারা হিংসার কাজে লিপ্ত হয়েছে, তারা সকলেই যে দুঃখে রাগে জ্ঞান হারিয়ে এমন কাজ করেছে, তাও নয়। তাদের মধ্যে অনেক স্বার্থান্বেষী দুর্বৃত্তও আছে, যারা এই নিদারুণ ঘটনা

থেকে নিজেদের একটু সুবিধা করে নেবার চেষ্টা করেছে। মানব চরিত্রের একটা বড় ঘৃণ্য দিক পৃথিবীর চোখের সামনে ধরা দিয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীকে কাছের থেকে দেখার সুযোগ তোমাদের মধ্যে হয়তো মাত্র দু-চারজন পেয়েছ, কিন্তু সমস্ত দেশের সামনে তাঁর যে রূপটি প্রকাশ সেটিও অসাধারণ। ছোটবেলা থেকে গান্ধীজীর অহিংস-নীতিতে মানুষ হয়েছিলেন। বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মনে হত এ পৃথিবীতে সকলের স্থান আছে। নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা সংস্কৃতি, নানা ভাষা, নানা নিয়মকানুন দিয়ে এ সংসার সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারে। ভারি উদার মন ছিল, অসম্ভব সংযমও ছিল; অন্যায় ছাড়া কোনো কিছুর সঙ্গে তাঁর বিবাদ ছিল না। যেটাকে শ্রেয়ঃ বলে মনে করতেন, তাকেই সমর্থন করতেন; অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হলেও পিছ-পাও হতেন না।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, জহরলাল এই তিনজন অসাধারণ মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে, তাঁর মধ্যে তিনটি মহৎ গুণ ফুটে উঠেছিল। নির্ভীক আদর্শবাদ, জনসাধারণের প্রতি মমতা আর তীক্ষ্ণ, বলিষ্ঠ রাজনীতি-জ্ঞান। এর ফলে তিনি পৃথিবীর একজন মহান্ নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। স্বদেশটাকে বিদেশীর চোখের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

সব সময় দেশটাকে গড়তে চাইতেন, জোরালো করতে চাইতেন, সকলের সঙ্গে সকলকে সমান সুযোগ দিতে চাইতেন। পারেন নি এত সব করতে, একা পারার কাজও নয় এগুলি। জহরলালের মতোই তিনিও বিশ্বাস করতেন দেশের ছেলেমেয়েরাই হল দেশের ভবিষ্যৎ। তাই কোনো দিক দিয়ে যেন দেশটা পিছিয়ে না থাকে। যতটা সম্ভব এগিয়ে দিতে হবে। খেলাধুলোয়, লেখাপড়ায়, জ্ঞান-

বিজ্ঞানে, শিল্পে-সংস্কৃতিতে, আন্তর্জাতিক যাবতীয় প্রতিযোগিতায়, সব কিছুতে দেশের ছেলেমেয়েরা অংশ নেবার সুযোগ পাক। এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। এর জন্য অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে তাঁকে। গরীবের ঘোড়া রোগ ; খেতে পায় না, আর্যাভট্ট ওড়ায়, এদিকে তিনভাগ দেশবাসী নিরক্ষর, ওদিকে মহাকাশচারী তৈরি হচ্ছে। এ-সব মন্তব্যে যে কিছুটা সত্যি নেই তাও বলা যায় না। সেই সঙ্গে যে দেশের ভবিষ্যতের বিশাল সম্ভাবনারো একটা স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে, তাও মানতে হবে। যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়ে গেলেন, এবার তোমরা তাকে বাস্তবে পরিণত করবে। যেখানে ফাঁক থেকে গেছে সেগুলি পূর্ণ করবে।

চারদিকে চোখ ছিল তাঁর। প্রধানমন্ত্রী হবার আগে কিছুদিন তিনি দিল্লীতে বেতার ও তথ্য মন্ত্রী ছিলেন। আমি তখন বেতারের একজন প্রযোজক। সে সময়ে বেতারের ওপরের গ্রেডের কর্মচারীরা নানা সুযোগ সুবিধা পেলেও, গাইয়ে বাজিয়ে অভিনেতা লেখক ইত্যাদি নিয়ে মস্ত এক স্টাফ আর্টিস্ট গোষ্ঠি ছিল। তাঁদের অনেকেই গুণী মানুষ। কিন্তু চাকরি বা মাইনের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, এক মাসের নোটিসে ছাড়ানো যেত, গ্রেড বলে কিছু ছিল না, যৎ-সামান্য বেতন ছিল, কোনো সুযোগ সুবিধাও ছিল না। ইন্দিরা গান্ধী এসেই এই অবস্থা পাল্টে দিয়েছিলেন। এখন স্টাফ আর্টিস্টরাও কর্মচারীদের সমান সুযোগ সুবিধা পান।

কিছুদিন শান্তিনিকেতনের শ্রীভবনে অন্য মেয়েদের সঙ্গে থেকে, ইন্দিরা পড়াশুনো করেছিলেন। অনেক পরে তাঁকে বলতে শুনেছি ঐ দিনগুলি তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়ের মধ্যে ছিল। এখনো দু-দিনের জন্য এলে শরীরে মনে কত জোর পান। ওঁর বাবাও এ কথা বলতেন। শান্তিনিকেতনে যেন ওঁদের ঘাড় থেকে

দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে যেত। গত বছরেও দেখেছি শ্রীভবনের ছোট মেয়েরা তাঁর হাত ধরে টেনে বলছে, 'ইন্দিরাদি, আমাদের ঘরে চলুন।' আর উনি বলছেন, 'আজ তো হবে না। আবার আসব।' এক সঙ্গে সারি বেঁধে ফটো তুলতে দেখেছি। ওদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলেছেন। বাংলাকে ভালবাসতেন।

বিদেশে ভারতের অনেক শত্রু আছে, তাতে সন্দেহ নেই। ইন্দিরা গান্ধীকে তারা বলে লোহার তৈরি মেয়ে। অবিশ্যি ইংল্যাণ্ডের মার্গারেট থ্যাচারকেও তাই বলে। আসলে মেয়েরা প্রাধান্য পেলে কেউ কেউ খুশি হয় না। তবে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়। ইন্দিরা গান্ধীর লোহার নিচে পদ্ম ফুলের পরিচয়ও পাওয়া যেত। কারো সঙ্গে নিচ বা অভদ্র ব্যবহার করতেন না। দরকার হলে ভদ্র ভাবেই কড়া কথা শুনিয়ে দিতেন। ভয়ডর কাকে বলে জানতেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে সাফল্যময় দেশের নেতাদের পাশে মাথা তুলে দাঁড়াতেন; সৌজন্যের পথ থেকে এতটুকু সরে যেতেন না।

আর যদি চেহারার কথাই তোলা যায়, আমাদের এই কালা-আদমিদের দেশের এই ৬৭ বছর বয়সের প্রতিনিধির রূপে ভুবন আলো হয়ে থাকত। তাঁর ধারে কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত না, এ-কথা বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অসংখ্য দর্শক মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। যেমন রূপ, তেমনি চলাফেরা, কথাবার্তা, সংযত সুন্দর সাজ-পোশাক, যার মধ্যে এতটুকু সাহেবিয়ানা থাকত না।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর, এক রকম বিনা প্রস্তুতিতে একবাক্যে সকলে জহরলালের কন্যাকে নির্বাচন করেছিলেন। সে সময় কোনো কোনো স্বার্থান্বেষী রাজপুরুষ যদি আশা করে থাকতেন, এই কোমলা অনভিজ্ঞা মেয়েটিকে দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে, তাঁরা কাজের সময় দেখেছিলেন

ফুলের মধ্যে বজ্র আছে। বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে দেশকে যেমন রক্ষা করতে পারেন ইন্দিরা, বেদনাহত দেশবাসীদের দুঃখ দূর করতেও তেমনি এগিয়ে আসেন। এখন সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখেছে বজ্রের মধ্যে ফুল আছে।

কোনো গোঁড়ামি নেই ওঁদের বংশে, অথচ দেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতি কত ভক্তি। আর ছিল বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশকে নব নব দিগন্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বাসনা। তোমরা যদি সেই বাসনার একটুখানিকেও বাস্তব রূপ দিতে পার, তাহলে এ-দেশে জন্মানো তোমাদের সার্থক হবে। ওঁদের মতো দেশটাকে যদি ভালোবাসতে পার, তা হলেই অনেক হবে।

বিজ্ঞান-সাহিত্য

যা কিছুকে চেতনা, উপলব্ধি, বুদ্ধি আর কল্পনা দিয়ে আয়ত্ত করা যায়, জ্ঞান বলতে সে-সমস্তকেই বুঝতে হবে। কাজেই তার ক্ষেত্রও অপার এবং অপরিসীম। তারি মধ্যে কোনো বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলন করাকে আমরা সাধারণ মানুষরা বিজ্ঞান বলে ভাবি। আরো মনে করি বিজ্ঞান আর সাহিত্য দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। বাস্তব নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার, অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে সাহিত্যের। কিন্তু এই আলাদা করার চেষ্টাটাকে কিঞ্চিৎ হাস্যকর বলে মনে হয়।

মাটির ওপরে ডালপালা বিস্তার করে, সবুজ পাতা মেলে যে সুন্দর ফুলটি ফোটে, তার সুগন্ধে বাতাস আমোদিত হয়। ওদিকে মাটির নিচে রংহীন শিকড়টি কঠিন পাথর ভেদ করে গাছের জন্য রস আহরণ করে, তবে না গাছের শিরায় শিরায় সেই রস প্রবাহিত হয়ে ফুল ফোটায়, রং ধরায়, সৌরভ ছোটায়। সাহিত্য কর্ম হল ঐ পাতায় ঘেরা ফুলটির মতো, যার বিকশিত হওয়া সম্ভব হত না, যদি না লোক-অন্তরালে বিজ্ঞানীর সত্যসন্ধানী দৃষ্টি কাজ করত।

সাহিত্যের প্রধান উপজীব্যই হল রস। সাহিত্য কর্মের বাইরের রূপটি যেমন-ই হক না কেন, তাকে লালিত-পালিত হতেই হবে সত্যের কোলে, নইলে সে সাহিত্য নামের যোগ্য হবে না। এ সত্য বাস্তব জগতের ঘটনামূলক সত্য না-ও হতে পারে, কিন্তু হাজার কাল্পনিক ব্যাপার হলেও, তার ভাবগত সত্য অক্ষুণ্ণ থাকা চাই।

তার মানে সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে আদর্শগত কোনো তফাৎ নেই। দুজনেই সত্যকে খোঁজেন; একজন ভাবের পথ ধরে আর অন্যজন বাস্তবের পথ ধরে, প্রতিটি তথ্য পরীক্ষা করে, গবেষণার সাহায্যে। যদি কখনো পুরনো প্রতিষ্ঠিত কোনো তথ্যে কোনো ভুল ধরা পড়ে, বিজ্ঞানী নির্মমভাবে তাকে বর্জন করে, নতুন তথ্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞানের গবেষণায় ভ্রান্তির সুযোগ থাকলেও, অসত্যের স্থান নেই। তথ্যগত ভুলেরো নয়।

সাহিত্যিক নিজের কল্পনাকেই আশ্রয় করে থাকতে চান, তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যখন যা দরকার হয়, সেগুলি খুঁজে বেড়ান। তথ্যে ভুল থাকলে, সাহিত্য কর্মেও খুঁৎ থাকে। যদি ভুল ধরা পড়ার আগে সাহিত্যকর্মটি প্রকাশিত হয়ে গিয়ে থাকে, সে-ভুল শুধরোবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তথ্যগত সত্যের চেয়ে ভাবগত সত্যের গুরুত্ব বেশি। তাই অনেক স্বনামধন্য লেখকের বিখ্যাত রচনায় ভুল থাকা সত্ত্বেও, তার আদর কমে না।

বিজ্ঞান আর সাহিত্য নিজের নিজের ক্ষেত্রে এতকাল নির্বিঘ্নে চলে আসছিল। কল্পনা বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষকের আদৌ চলে না। তবে পরখ না করে তাঁরা কল্পনার প্রশ্রয় দেন না। প্রতিটি নতুন আবিষ্কারের পিছনে, বিজ্ঞানীর দুঃসাহসিক কল্পনা কাজ করে। আর কাজ করে গবেষকের অবিরাম সাধনা।

গত ৫০ বছর ধরে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞান-সাহিত্য বলে এক নতুন জিনিসের জনপ্রিয়তা বিশেষতঃ কিশোর সাহিত্যে এতই বেড়ে গিয়েছে যে এখন তাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় বলে স্বীকার করতেই হয়। যদিও বাংলায় এখনো এর প্রচার কিশোর-সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, বিশ্বসাহিত্যের সর্বত্র এর জয়জয়কার। এমন-ও বলা যায় দিনে দিনে সাহিত্যে মানবিকতার আদর কমে

যাচ্ছে। আপাততঃ সে প্রসঙ্গ থাক।

বিজ্ঞান-সাহিত্য বলতে আমি প্রধানতঃ বাংলা কিশোর সাহিত্যের কথাই ভাবছি। তিন রকম রচনার কথা মনে পড়ছে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প উপন্যাস, কল্প বিজ্ঞানের গল্প এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধজাতীয় রচনা। তিনটির তিন রকম ভূমিকা, তিন রকম বিপদ-আপদ।

ভালো বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পের তুলনা হয় না। একসঙ্গে জ্ঞান-বিস্তার এবং গল্পের আনন্দ যোগায়। বিপদ হল গল্প বলার উৎসাহে বৈজ্ঞানিক তথ্যটির না ক্ষতি হয়ে যায়। সার্থক বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনা খুব সহজ কাজ নয়। একাধারে তথ্যগত সত্য আর কল্পনারসকে অক্ষত রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রের সার্থক লেখকদের হাতে গোণা যায়। রসোত্তীর্ণ না হলে কেউ পড়বে না। মানবিকতার স্পর্শ না থাকলে সার্থক সাহিত্য হয় না। এই জন্য অনেক নিভু‍র্ল তথ্যসমৃদ্ধ লেখাও আদর পায় না।

বিজ্ঞানের গন্ধ থাকলেই পাঠকরা অনেক সময় গল্পকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক বলেন। অজেয় রায়, সঙ্কর্ষণ রায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লেখেন। সেখানে বিজ্ঞানটাই মুখ্য, আর সব কিছু তার সহায়ক। সত্যজিৎ রায়ের অপূর্ব গল্পগুলি, কিম্বা আমার নিজের এই ধরনের রচনাকেকল্প-বিজ্ঞান বলা উচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞান-কল্প ; যা বিজ্ঞানের মতো হলেও, ঠিক বিজ্ঞান নয়। এ ক্ষেত্রে রস-সৃষ্টিই প্রধান স্থান নিচ্ছে, বিজ্ঞান কিছু অতি-কাল্পনিক মাল-মশলা যোগাচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। বিপদ হল যেটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়, সেটা সব সময় নিভু‍র্ল হওয়া চাই। তা না হলে নবীন পাঠকের অশেষ ক্ষতি হয়।

আজকাল বিজ্ঞান-সাহিত্যে প্রবন্ধের আদর বেড়েছে। প্রাণী-

বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, ভ্রমণ কাহিনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী, বৈজ্ঞানিকদের জীবনী—এ-সব একেকটি সোনার খনি। এখানেও একই কথা ওঠে; রসোত্তীর্ণ না হলে পাঠকদের কাছে আদর পাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো কাল্পনিক সাজসজ্জা দিয়ে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা চলবে না। স্বচ্ছ নির্মল প্রবল সত্যের নিজস্ব একটা মধুর রস থাকে। এমন কি গণিতেও এ-রসের দেখা পাওয়া যায়। এ হল সব রসের পরম রস। এর কাছে কোনো রকম কৃত্রিম রস দাঁড়াতে পারে না। এ-সব হল সত্য সাধনার অঙ্গ। কৃত্রিম সাজসজ্জা না থাকলেও, এর একটা ব্যক্তিগত আবেদন থাকে, কারণ বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রাণ-ধারণেরি একটা অংশ। কোনো জটিল বিষয়বস্তু যা বিশেষজ্ঞ ছাড়া কারো বোধগম্য হবে না, বিজ্ঞান সাহিত্যের আওতায় পড়ে না। তাই দিয়ে ঐ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাকে সাহিত্য নাম দিলে ভুল হবে।

বিজ্ঞান সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষা বিষয়েও কিছু বলতে হয়। সে ভাষা হবে সহজ, সরল এবং সুস্পষ্ট। বৈজ্ঞানিক শব্দ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। বিদেশী নাম কি বর্জন করা উচিত? তার জায়গায় সমার্থক বাংলা নাম স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়। তবে আমার মনে হয় বিজ্ঞানের একটা আন্তর্জাতিক দিক আছে। যে-সব আখ্যা ইউরোপ অ্যামেরিকার সব ভাষাতেই স্থান পেয়েছে, আমাদের কিশোর পাঠকদেরো সে শব্দগুলি জানা উচিত। এই সমস্যা দূর করার সহজ উপায় হল, বাংলা বইতে বাংলা শব্দটি ব্যবহার করলেও, তার পাশে ব্র্যাকেটে বিদেশে প্রচলিত পরিশব্দটি সর্বদা দেওয়া উচিত। এই ভাবে ব্যবহারিক কারণে আইন-আদালতের ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান আরবি ফারসি শব্দ বাংলা অভিধানে জায়গা পেয়ে, বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

গরমে ঠাণ্ডা

কালোপযোগী না হল তো গান কিসের? আমি এক্ষুণি উপেন্দ্র-কিশোরের একটা গানের কথা বলতে পারি যা কাব্যগুণের দিক থেকে না হক, এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের চেয়েও উৎকৃষ্ট। তার আরম্ভটা এই রকম—

বড় গরম, ভারি গরম, ঠাণ্ডা সরবৎ আনো;
হাতপা কেমন করছে কনকন, জোরে পাখা টানো!

কেমন, মনকে নাড়া দিচ্ছে কি না বল।

গরম দেশে যখন যে কারণেই হক, জন্মানো গেছে, তখন শুধু গরম! গরম! বলে বুক চাপড়ালেই তো হবে না, অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করতে হবে। গরমটাকে বিশেষ কমানো যাবে না এটা ঠিক! শুনেছি অক্ষদণ্ডের ব্যাপার। শেষটা কি হতে কি হয়ে যাবে, ও-সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা সম্ভবও নয়, হলেও দরকার নেই!

সুখের বিষয়, গরম না কমিয়েও গা ঠাণ্ডা করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি বিজলির যতই না প্রযুক্তির উন্নতি হক, আমাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বরং কিছু অবনতিই দেখা যাচ্ছে। টানা-পাখা নেই; পাখা যারা টানত তারাও নেই। যদি কোথাও এক আধটা টানা পাখা দেখতেও পাও, সেটা যেন টানতে যেও না। এক সায়েব লিখেছেন দক্ষিণ ভারতে এক খালি পড়ে থাকা অতি পুরনো ডাক-বাংলোর খাবার টেবিলের ওপর দেখেন নক্সা-করা চমৎকার এক পাখা

ঝুলছে। তবে আর ঘেমে মরা কেন? সকলকে নিচে বসিয়ে, যেই না বারান্দায় গিয়ে দড়িটা একটু টেনেছেন, অমনি পাখার ভাঁজ থেকে টেবিলের ওপর ঝুপঝাপ করে অদ্ভুত চেহারার টিকটিকি গিরগিটি মাকড়সা, এমন কি সবুজ রঙের খুদে একটা সাপ পর্যন্ত পড়ল। সাপটা আবার একজন বড়লোককে কামড়েও দিল। তবে সায়েব লিখেছেন সে লোকটি বড় খারাপ ছিল, তার অভাবে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি।

অতএব টানা পাখার কথা ভুলে যাও। অন্য উপায়ও আছে। বাইরে থেকে গা ঠাণ্ডা না করে, ভেতর থেকে করার চেষ্টা দেওয়া যায়। ফ্রিজের যুগের আগে খাবার জল ফুটিয়ে, ছেঁকে, জগে ঢেলে, জগটা বরফে বসিয়ে ঠাণ্ডা করতাম। আমার বুড়ি ননদ বললেন, 'ও কি হচ্ছে? পয়সা খরচ করে জল ঠাণ্ডা করে কেউ?' তাহলে কি করতে হবে? 'কেন, গরম থাকতেই জলটাকে মাটির কলসিতে ঢেলে, একটা পুরনো শাড়ি চার ভাঁজ করে জলে চুবিয়ে, ভিজে কাপড়টি কলসির গায়ে জড়িয়ে, সবসুদ্ধ চড়চড়ে রোদে বসিয়ে রাখ। কাপড়ও খটখটে, জলও হিম!' হাসি পেল। তবু দেখি সত্যি তাই। কাপড়ের জল রোদে শুকিয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। সেই সঙ্গে কলসির গা থেকে গরমটুকুও উপে গেছে। গরমে ঠাণ্ডা হবার এই হল প্রধান নিয়ম। ঘেমো গায়ে হাওয়া খেয়ে দেখো তো কি হয়। ভিজে গেঞ্জি গায়ে বা ভিজে পাটিতে পাখার নিচে শুলে গা হয় হিম। এমনি হিম যে কারো কারো সর্দি কাশি ব্রংকাইটিস নিউমোনিয়া—থাক্, বাকিটা বললাম না।

ঐ যে বললাম গরম কমানো যায় না, গা ঠাণ্ডা করতে হয়, ও কথাটা ঠিক নয়। শান্তিনিকেতনে আগে বছরে তাপমাত্রা উঠত ১১৬° এবং ১৫ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি হত না, লু বইত, পুকুর কূয়ো শুকুত,

টেঁকা যেত না। তারপর আশ্রমবাসীরা ফলগাছ ফুলগাছ লাগিয়ে একটা তপোবন বানিয়ে ফেলল। এখন তাপমাত্রা বড় জোর ১০৬°, বৃষ্টি পাঁচ গুণ, গ্রীষ্মে লোকে চেঞ্জ করতে আর আম কাঁঠাল খেতে আসে।

ঐ খাওয়ার ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করবে না। কাঁচা ইলিশ পেলে তার ঝোল খাবে। অন্য আমিষ যতটা সম্ভব বাদ। কাঁচা আমের সরবৎ, তেঁতুলের বা ঘোলের সরবৎ, ডাবের জল, আম জাম বাতাবি-লেবু তালশাঁস শাঁকালু চাঁপা কলা ইত্যাদি খাবে। একবার আমার মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু বলেছিলেন, 'গরমকে ভয় পাও কেন? সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা অবধি দরজা-জানলা বন্ধ করে রেখো, দেখবে গ্রীষ্মকাল কত ভালো। তখন জানলায় কাচ দিত না কেউ, তাই বললাম, 'অন্ধকারে কি করব?' 'আলো জ্বেলে ছবি আঁকবে, পড়বে, লিখবে। অন্ধকারে ঘুমোবে। শরীর ভালো হয়ে যাবে।'

আরো নিয়ম আছে। তিনবার চান করবে। গা টা গরম হতেই দেবে না। বেরুতে হলে মাথায় ভিজে গামছা জড়াবে; ছাতা খুলবে। তার চেয়েও ভালো, বেরুবে না।

ঐ দরজা-জানলা বন্ধ করার কথায় মনে পড়ল, ১২ বছর বয়সে শিলং থেকে এসে কলকাতাবাসী হলে প্রথম গ্রীষ্মটাকে গোড়ায় অসহ্য মনে হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হল। লাউয়ের ঝোল, লেবু ভাত, দই ভাত আর যত রকম ফল। সকাল থেকে জানলা বন্ধ। দুপুরে মেঝেতে ভিজে ন্যাতা বুলিয়ে, মাদুর পেতে, সারি সারি শুয়ে পড়তাম। হঠাৎ দেখি জানলার উল্টো দিকের দেয়ালে, পথের মানুষজনের গাড়ি-ঘোড়ার চলন্ত ছায়া ছোট, এবং উল্টো হয়ে পড়ছে। চাকা ওপরে গাড়ি নিচে; মানুষের ঠ্যাং ওপরে, মুণ্ডু নিচে; সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য কি আর বলব। গা তো ঠাণ্ডা

হতই, মনও শান্ত-শীতল।

বিকেলে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে কে নিয়ে যাবে? গা ধুয়ে ছাদে পাইচারি করতাম। পাড়ার সবাই তাই করত। সকলের কাচা কাপড় দড়িতে ঝুলত। সকলের ঘরের খবর সকলের জানা হয়ে যেত। ভারি একটা অন্তরঙ্গতা তৈরি হত। জাতীয় আন্দোলনের ঐক্যের মূলেও সেটা হয়তো কাজ করত। গায়ে মনে হাওয়া লাগত, গরম কিছু ঠাণ্ডা হত।

আরো সন্ধ্যায় কুলপী-ওয়ালা সটাং ছাদে উঠে আসত। দু-চার পয়সায় ডাবের কুলপী থেকে আট আনায় মালাই কুলপী, যার যা পছন্দ। হাঁড়ির মধ্যে বরফের কুচির কলকল ছলছল শুনেই প্রাণটা শীতল হত। আইসক্রীম তার কাছে লাগে না। আইসক্রীমের মানসিক দিক বলে কিছু নেই।

ইতিহাস ঘেঁটে গরমে ঠাণ্ডা হবার অজস্র উপায় তোমাদের শিখিয়ে দিলাম। তাতেও যদি মন না ওঠে, তাহলে শেষ ও শ্রেষ্ঠ উপায়টার কথাও বলতে হয়। তাতে কিছু উপকরণ দরকার হবে। দুটো মাঝারি সাইজের হাল্কা মই, যা কারো মাথায় পড়লেও জখম হবে না। এক জোড়া সাদা পুরনো এবং পরিত্যক্ত বিছানার চাদর, যাতে কাঁচি দিয়ে দুটো করে চোখ কাটলেও ক্ষতি হবে না। দুটো পেন্সিল টর্চ। একটা কাঁচি। দুটো ছেঁড়া কালো গেঞ্জি বা শার্ট। তাতে কংকালের গা আঁকার জন্য ফসফরাসের গুঁড়ো মেশানো সাদা রং ও দুটো উপযুক্ত কাঠি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস টগবগে গরমেও এই সমস্ত উপকরণের সাহায্যে যে কোনো দুজন তৎপর ও পরোপকারী ছেলে বা মেয়ে বাড়িসুদ্ধ, বন্ধুবান্ধব সহ সকলের হাত-পা বরফ, রক্ত হিম, হাঁটু ঠকাঠক ও দাঁতে দাঁতকপাটি লাগাবার উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য উপায় উদ্ভাবন করতে পারবে। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।

'সন্দেশী'

থেকে থেকে একবার করে গোড়ার কথা মনে করা ভালো। যারা সন্দেশ পড়ে, যারা সন্দেশে লেখে, যারা সন্দেশ ছেপে বের করে, তাদের সকলকে আমি বলি 'সন্দেশী'। সন্দেশীদের কোনো নিয়ম কানুন নেই। সন্দেশকে ভালোবাসলেই হল।

গোড়ার কথা বলতে গেলে, সবার আগে আমার মেজ-জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর, আমার ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন, আমার বড়দা সুকুমার, এঁদের কথা মনে হয়। এঁদের বিষয়ে অন্য সময় অনেক বলা হয়েছে। যাঁর বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়নি, তিনি হলেন সুকুমারের পরের ভাই সুবিনয়, আমাদের মণিদা।

আগের কথা আগে বলি। সবার বড় সুখলতা রাও। তাঁর ডাকনাক ছিল হাসি। যেমন সুকুমারের ডাকনাম ছিল তাতা। রবীন্দ্রনাথের হাসি আর তাতার কথা পড়েছ তো? নামে হাসি, মনেও অনেকখানি প্রসন্নতা হলে হবে কি, মুখখানি এবং চালচলন এত বেশি গুরুগম্ভীর যে হাসি নামটা চলল না। সবাই ডাকত সুখলতা।

ছোট বেলায় বড়দি বেজায় ভীতু ছিলেন। সেকালে সবাই পিঁড়ি পেতে খেত। বড়দা পিঁড়িতে বসেই হয়তো বললেন, 'ও দিদি, তোমার পিঁড়ির নিচে লালচে কি?' অমনি লাফ ঝাঁপ, চিৎকার, 'নিশ্চয় তেলাপোকা!' খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠত।

সেকালে ট্যাক্সি ছিল না, লোকে ঘোড়ায়-টানা ঠিকে গাড়ি চড়ত। যদি দু-ঘোড়ার গাড়ি আসত, বড়দি বলতেন, 'ও বাবা! তেজী চেহারার দুটো ঘোড়া! নিশ্চয় গাড়ি উল্টোবে!' যদি এক-ঘোড়ার গাড়ি আসত, বড়দি বলতেন, 'খালি একটা ঘোড়া কেন? নিশ্চয় বদমেজাজী। পাশে আরেকটাকে জুতলে তাকে কামড়ায়!'

তাহলে হবে কি, বাড়িতে বসে বাবার কাছে শিখে অমন সুন্দর তেল-রঙের, জল-রঙের ছবি এ দেশে সে সময় কোনো মেয়ে আঁকত বলে শুনিনি। অপূর্ব সব ছড়া, গান, কবিতা, খুদে খুদে নাটিকা লিখতেন, বিদেশী পরীদের গল্প নিজের মতো করে বাংলায় লিখতেন। মনে হত আমাদেরি ঘরের আশ্চর্য জিনিস। অনেক সময় ভাবি বড়দির সব গান, গল্প, কবিতা, ছবি দিয়ে এমন একখানা বই হয়, যার জুড়ি মেলা দায়। বুড়ো বয়সে ছোটদের অ-আ-ক-খ শেখাবার চমৎকার বই লিখেছিলেন। এখনো তার কত আদর।

বড়দির পর বড়দা, তারপর মেজদি। তিনি হলেন তোমাদের নলিনীদির মা পুণ্যলতা চক্রবর্তী। যেমনি আমুদে, তেমনি রান্নাবান্না সেলাই ঘরকন্নায় পটু। বাড়িটি ছিল একটা আনন্দ-নিকেতন। তাঁর লেখা 'ছেলেবেলার দিনগুলি' পড়। অমন বই হয় না।

মেজদির পর মণিদা, যাঁর কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। ভারি রসিক ছিলেন, কথায় আর কাজে সে যে কত মজা। চমৎকার রসের গল্প লিখতেন। বেশির ভাগই সন্দেশে বেরুত। যখন সন্দেশ বন্ধ ছিল, তখন মৌচাকে, রামধনুতে। পরে খাসা সব বই হয়েছিল; ধাঁধা, কথার খেলা, ছোট ছোট হাসির গল্প, তাঁর মতো কারো হাত থেকে বেরোত না।

যাকে বলে অজাতশত্রু, সেই রকম মানুষ ছিলেন।

সব সম্পাদক প্রকাশক লেখকদের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। শিশু-

সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে তাঁর জানতে এবং জানাতে কিছু বাকি ছিল না। একটা সরস মন্তব্য, দুটো একটা মজার কথাই যথেষ্ট হত। লেখকরা পথ পেয়ে যেতেন। কতজনে পরে আমার কাছে গল্প করেছেন।

তাঁর মজার মজার কথা, নানা রকম রগড় আমাদের কৈশোরটাকে জমিয়ে রাখত। একটা ঘটনা বলি। তখন আমি কলেজে পড়ি। আমার জন্মদিনে মণিদা আমার হাতে একটা এসেন্স মাখা গোলাপি চিঠি দিয়ে বললেন, 'একটা লোক দিয়ে গেল।' খুলে দেখি নিস্তারিণী পিসিমা আমাকে শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। শেষে লিখেছেন 'গরীব পিসিমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ করে আমাকে সুখী কর।'

অথচ যে চিঠি এনেছে তাকে নাকি আমার ভাইরা ভাগিয়ে দিয়েছে। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'এ কি রকম অভদ্রতা, তিনি কি মনে করবেন! ধন্যবাদ দিয়ে একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল!'

মণিদা তাই শুনে বার বার বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়, তাছাড়া উপহারটা গেল কোথায়? সেটাও তো খোঁজা উচিত।' হঠাৎ কেমন খট্‌কা লাগল। আমাকে দিয়ে উপহার খোঁজানোতে মণিদার এত আগ্রহ কেন? অমনি চেপে ধরলাম, 'নিস্তারিণী পিসিমা না আরো কিছু! সব তোমার সাজানো ব্যাপার!' তখন সকলের কি হাসি! সবচেয়ে মজার কথা হল যে উত্তেজনার চোটে আমি ভুলেই গেছিলাম যে নিস্তারিণী পিসিমা বলে আমাদের আদৌ কোনো পিসিমা নেই! এমনি করে আমাদের কম বয়সটা মণিদা আনন্দে ভরে রাখতেন। মাত্র ৫২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মণিদার পর টুনিদি, তারপর নানকুদা। তাঁদের কথা আরেকবার হবে।

লেখক হওয়া

এসো, তোমাদের লেখক হবার আরেকটা পাঠ দিই! শ্রেষ্ঠ এবং সত্যিকার সাহিত্যিক হলেন তাঁরাই, যাঁরা মৌলিক রচনা লেখেন। তাঁরা যদি পুরনো গল্পও নতুন করে লেখেন, তার মধ্যেও নিজের মনের ভাবটি ঢেলে দেন। উপেন্দ্রকিশোরের ছোট্ট রামায়ণ, কিম্বা টুনটুনির বই; সুকুমার রায়ের ব্যাঙ রাজার বা সুখী মানুষের গল্পকে এ-কথার প্রমাণ বলে ধরা যায়।

আগাগোড়া মনগড়া গল্প কবিতার কথা আবার অন্য ব্যাপার। পড়লে মনে হয় গল্পটি, কবিতাটি মনের মধ্যে আপনি ফুটেছিল। লেখক তাকে কাগজে নামিয়ে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। সে-ও কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়। মাঝে-মধ্যে যদিও সে আগা-গোড়া তৈরি হয়ে লেখকের কাছে ধরা দেয়, তিনি হয়তো এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে কাগজে কলমে রূপ দিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এই ভাবে রচিত। এক সন্ধ্যায় দু-তিনটি হয়তো লিখে ফেললেন! সঙ্গে সঙ্গে সুরটিও মনে এল। অমনি ছুটলেন ভাইপো দিনেন্দ্রনাথের কাছে। তাকে সুরটি শিখিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সে কখনো ভোলে না।

তবে এ হল অসাধারণ মানুষদের কথা। কবিতা, গান, ছড়া যদি বা এ-ভাবে হয়, কিন্তু গদ্য রচনা সাধারণতঃ আলাদা ব্যাপার আর সত্যি কথা বলতে কি খুব কম কবিও এতটা পারেন। বেশির ভাগ সময়

ভাবনাটা মনের মধ্যে ছটফট করে কিন্তু কথার ফাঁদে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। পাখির মতো মনের আকাশে উড়ে বেড়ায়। লেখকরা লেখেন আর কাগজ এবং নিজের মাথার চুল ছেঁড়েন।

তারপর অনেক চেষ্টা, অনেক মেহনত করে যদি বা ভাবনাটাকে কিছুটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা গেল, তবু শেষ পর্যন্ত কাগজে তার যে চেহারা ফুটল, তা দেখে লেখকের মন ওঠে না। কেবলি মনে হয়—আমি যা বলতে চাই, তা তো ঠিক বলতে পারিনি! আসল কথাগুলোকে ধরতে পারছি না কেন? মনটা হতাশায় ভরে যায়। অন্য লোকে ভালো বললেও, নিজে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না।

তার আসল কারণ হল যাকে ধরা লেখকের সাধ্যের বাইরে, তিনি তাকেই কথায় বন্দী করতে চান। কাঠকুটো মাটি রং সুর কথা দিয়ে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়া যায় না। খানিকটা হয়, খানিকটা হয় না। কিন্তু ঐ অসন্তোষটাই বার বার চেষ্টা করার শক্তি যোগায়।

এসব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কথা বাদ দিয়েও অনেক গুণী লেখক আছেন, যাঁরা নানা দুঃখ-হতাশায় ভরা এই সংসারটাকে অনেক সান্ত্বনা, অনেক আনন্দ দেন। দুটো বুদ্ধির কথা, রসের বিষয়, মজার ব্যাপার, আশ্চর্য ঘটনা আর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁদের মালমশলা। তাই নিয়েই আমাদের দশজনের মতো সাধারণ মানুষদের আনন্দ। সুখ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে? এ-সব হল বিনি-পয়সায় বিলিয়ে দেওয়া, সব দুঃখ-ভাবনা দূর করা মহামূল্য সামগ্রী। এ জিনিস তোমাদের চারদিকেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। শুধু তুলে নেবার, ভাষা দিয়ে গুছিয়ে দেবার অপেক্ষা।

আমাদের সকলের জীবনেই নানা রকম চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ঘটে। আমরা হয়তো লক্ষ্যই করি না। সেগুলো চিরকালের মতো হারিয়ে যায়। আর একজন সম্ভাব্য লেখক নষ্ট হয়। চোখ কান খুলে

রেখো। একটা দুটো সরস কথা, একটা মজার দৃশ্যও যেন বাদ না পড়ে। সাধারণ লোকদের কথাবার্তা শুনো, নিজেও অনেক সুন্দর সুন্দর খাঁটি দিশী কথা শিখবে, যা অভিধানের কথার চেয়েও পবিত্র আর মধুর এবং সব চেয়ে বড় কথা, যার সাহায্যে মুখ্যুরাও মনের সুখ-দুঃখ প্রকাশ করতে পারে।

দেখবে চারদিকে লেখার সামগ্রী ছড়িয়ে আছে। অনেক বছর আগে রানিখেতে গিয়েছিলাম। সেখানে হিমালয়ের গায়ে ভোরের রোদ কেমন করে পড়ে দেখতে উঠে, আরেক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেতাম। নিচের খাদ থেকে ১০০ ফুট উঁচু এক ঝাউ গাছ উঠেছে। রোজ তারি মগডালে শাঁখের মতো শাদা, বাজ পাখির মতো বড় এক পাখি উড়ে এসে, ডানা গুটিয়ে বসত। ঠিক সেই সময় সূর্যের একটি রশ্মি তার গায়ে লাগত। শাদা পাখি সোনালি রং ধরত। সে চুপ করে বসে থাকত। তারপর যেই না সোনালি রশ্মি তার গা থেকে সরে যেত, সে-ও অমনি শাদা ডানা মেলে উড়ে যেত।

বল দিকিনি প্রকৃতির লেখা এ এক অপূর্ব কবিতা কিনা? দেখ তো একে কাগজে নামাতে পার কি না।

সব চেয়ে ভালো কবি একটি বই পাবে।
